# দ্বিতীয় অধ্যায়

## বাংলা হাসির গল্পের ক্রমবিকাশের ধারায় ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের স্থান, সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি-পরিচয় ও গ্রন্থ-পরিচয়

## ।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

### ২.১ (ক) ত্রৈলোক্যনাথঃ সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি-পরিচয় ও গ্রন্থ-পরিচয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ২২শে জুলাই, ১৮৪৭ (৬ শ্রাবণ ১২৫৪) উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শ্যামনগরের রাহুতা গ্রামে। পিতা বিশ্বম্ভর, মাতা ভবসুন্দরী। ত্রৈলোক্যনাথের রচনাগুলি পাঠ করলে বোঝার উপায় নেই যে তিনি বাল্যকাল থেকেই চরম দারিদ্র ও দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই শুরু করেছিলেন। অথচ তাঁর রসবোধ, ব্যঙ্গবিদ্রুপের উপলব্ধি ছিল সমুদ্র-সমান গভীর।

ত্রৈলোক্যনাথ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত ক'রে স্থানীয় মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অধ্যয়নের সময় ১৮৫৯ সালে স্কুলটি বন্ধহয়ে যায়। বাধ্য হ'য়ে তাঁকে হুগলির ডাফ সাহেবের স্কুলে ভর্তি করানো হয়। মেধাবী ত্রৈলোক্যনাথকে সেখানকার শিক্ষকরা পরীক্ষা করে 'ডবল প্রমোশন' দিয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে নেন। ডাফ স্কুলে এক বছর কাটিয়ে তিনি বাড়ির নিকটবর্তী গঙ্গাপারের ভদ্রেশ্বর তেলেনীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে আসেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য। এখানেও এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর অভাবনীয় পারিবারিক বিপর্যয় দেখা দেয়। বাড়িতে ম্যালেরিয়া মহামারিতে বৃদ্ধা পিতামহী, পিতা-মাতার স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মৃত্যু হয়। ত্রৈলোক্যনাথ তখন সবেমাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর বড় ভাই রঙ্গলাল পুরুলিয়ার উচ্চবিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্র। তিনি তাঁদের আত্মীয় শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকতেন। ত্রৈলোক্যনাথ ক্রমশঃ বুঝতে পারলেন পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব। স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ বাড়িতে এসে দেখলেন তাঁর ছোট ভাইগুলিও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই— তদুপরি অন্নকষ্ট। এর মধ্যে তিনি নিজেও আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া থেকে সেরে উঠলেও দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁকে পথে নামতে হল জীবিকার অন্বেষণে। বাবা-মার মৃত্যুর দু'বছরের মধ্যে ১৮৬৪ সালে আর এক দুর্যোগ উপস্থিত হল। যে বাগানের ওপর নির্ভর ক'রে স্থানীয় ভাবে তাঁদের কিছু আয় হত তাও বন্ধ হ'য়ে গেল প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে বাগানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ায়। সংসারের অভাব হয়ে উঠল তীব্রতর। চরম আর্থিক সংকটে আকুল হয়ে উঠলেন ত্রৈলোক্যনাথ। বাড়িতে বিনা কাজে বসে থাকবার মানুষ নন তিনি। অতএব পথে নামতেই হল তাঁকে। বাড়ি থেকে চলে গেলে সংসারের বোঝা কিছুটা হালকা হবে এই ভেবে ত্রৈলোক্যনাথ একদিন রাতে সকলের অজ্ঞাতে পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। যাবেন শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। সে সময় ত্রৈলোক্যনাথের বয়স চোদ্দ বছর। এই বয়সে দুঃসাহসিক যাত্রায় পা বাড়াতে তাঁর বিন্দুমাত্র পা কাঁপেনি। পকেটে যা কানাকড়ি ছিল তা দিয়ে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলের টিকিট কাটলেন। বাকী দীর্ঘপথ কপর্দকশূন্য অবস্থায় বনপথের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। তিন দিন নিরন্ন অবস্থায় হেঁটে তিনি গন্তব্যে পৌঁছলেন।

শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পুরুলিয়ার স্কুলে ত্রৈলোক্যনাথকে ভর্তি করিয়াছিলেন। ভর্তি হবার কয়েকদিনের মধ্যেই স্কুল কর্তৃপক্ষের নতুন ব্যবস্থানুসারে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তাঁকেও রাঁচি পাঠানো হল। কিন্তু রাঁচির শিক্ষাব্যবস্থা দেখে হতাশ হ'য়ে তিনি পদব্রজে পুনরায় পুরুলিয়ায় ফিরে এলেন। এই সময়ে তিনি রেফাকষু সেন নামক একজন সদাশয় মৌলবীর কাছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'পদ্মনামা' 'আদমনামা', 'গোলেস্তা,' 'বোস্তা' ইত্যাদি অধ্যয়ন শেষ ক'রে অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। কিন্তু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হওয়ায় তিনি ফিরে এলেন রাহুতায়।

১৮৬৬-১৮৬৭ —এই দু'বছরে ত্রৈলোক্যনাথ চারটি বেসরকারি স্কুলে চাকরি করেন। পুরুলিয়া থেকে রাহুতায় ফিরে এসে প্রথমে সাময়িকভাবে চারমাসের জন্য ইছাপুর স্কুলে, তারপর প্রধান শিক্ষক হিসাবে বীরভূমের দ্বারকা স্কুলে, সেখান থেকে চলে যান রাণীগঞ্জের উখড়া স্কুলে এবং সর্বশেষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জমিদারি পাবনার সাহাজাদিপুর স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন।

১৮৬৮ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কটকে উড়িষ্যা সরকারের পুলিশ বিভাগে সাব-ইন্সপেক্টর পদে কাজ জুটে যায় ত্রৈলোক্যনাথের। এই সরকারি চাকরি পাবার ব্যাপারে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন তাঁর নিকট আত্মীয়, কটকের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হরকালী মুখোপাধ্যায়। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে যে অসামান্য খ্যাতি ত্রৈলোক্যনাথ অর্জন করেছিলেন, তারও বীজ উপ্ত হয়েছিল এই উড়িষ্যায় স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে। তাঁর মধ্যে নানা প্রতিভার প্রথম সন্ধান পান হাণ্টার সাহেব। দেরি না ক'রে হাণ্টার সাহেব তাঁকে ১২৫ টাকা মাইনের স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে বিভাগের চাকরি দিয়ে কলকাতায় পাঠান। কলকাতায় ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল সার্ভে বিভাগে চাকরিতে যোগ দেবার পর থেকে ত্রৈলোক্যনাথের আর্থিক অনটনের অবসান হয়। এরপর তিনি সংসার জীবনে প্রবেশ করেন।কিন্তু এখানেও তাঁর বিধি বাম। প্রথমে তিনি কামিনী দেবীকে বিয়ে করেন। কিছুদিনের মধ্যে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান তিনি। এরপর বিয়ে করেন নবতারিণী দেবীকে। তিনিও অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে পুনরায় বিয়ে করেন কালীদাসীকে। তিনিও মারা যান নিঃসন্তান অবস্থায়। চতুর্থবারে সুরবালা দেবীকে তিনি বিয়ে করেন এবং তাঁর গর্ভেই কন্যা পরিবালা বা পরিতোষিণী এবং পুত্র সুধীরকুমারের জন্ম হয়।

১৮৭০-৭৫ সাল পর্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথ কলকাতায় প্রথমে 'বেঙ্গল গেজেটিয়ার'-এর কার্যালয়ে সাধারণ কেরানি ও পরে প্রধান কেরানির পদে উন্নীত হন। ১৮৭৫ সালে হান্টার সাহেব বিলেত চলে গেলে ত্রৈলোক্যনাথও কলকাতা ত্যাগ ক'রে উত্তর-পশ্চিম ভারত ও অযোধ্যা রাজ্যের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রধান কেরানির পদে যোগ দেন। তিনি কৃষিজীবীদের উন্নয়ন প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কারিগর বা হস্তশিল্পীদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বাস্তবোচিত ব্যবস্থায় মনোযোগী হয়েছিলেন।

১৮৮২ সালে ইউরোপের আমস্টার্ডম শহরে বাণিজ্য মেলা বসে। ভারত সরকার ত্রৈলোক্যনাথকে ঐ মেলায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করলেও তিনি পরিবার পরিজনের 'কালাপানি ভীতি'র কারণে প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও যেতে পারেননি।

১৮৮৬ সালে বিলাতের গ্লাসগো শহরে আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সেই প্রদর্শনীতে যোগদান করার জন্য ত্রৈলোক্যনাথের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। সকলের আপত্তি উপেক্ষা ক'রে একজন ব্রাহ্মণ পাচককে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিলেতে যান। এই যাত্রায় ইংল্যান্ড ব্যতীত স্কটল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও রোম হ'য়ে প্রায়-নয়মাস পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি কালাপানি পাড়ির ব্যাপারে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও ব্রাহ্মণ সমাজের প্রবল ক্রোধের সম্মুখীন হন। পরে পণ্ডিতদের নির্দেশমতো মাথা মুন্ডন, প্রায়শ্চিত্ত, যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদপাঠ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন করে যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রে ত্রৈলোক্যনাথকে পুনরায় ব্রাহ্মণ হ'তে হয়। যদিও সমাজ-নির্দেশিত এ'সমস্ত বিধিবিধানের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।

১৮৮৭ সালে ত্রৈলোক্যনাথ ভারত সরকারের নির্দেশে কলকাতা যাদুঘরের সহকারী কিউরেটরের পদ গ্রহণ করেন। এ'সময়ে তাঁর জীবনে নেমে আসে আবার বিপর্যয়। কলকাতার পটলডাঙার বাড়িতে এক বৈশাখের পড়ন্ত বিকেলে তিনি নিমগ্নচিত্তে লিখছিলেন। মেঝেতে গালিচা পাতা ছিল। কাঠের বাক্সের উপর কাগজপত্র, পাশে একটি তাকিয়া। লেখার কাজে যখন তিনি নিমগ্ন, ঠিক তখনই আচমকা উঠল কালবৈশাখী ঝড়। কলম হাতে ছুটে গেলেন জানালা বন্ধ করবার জন্য। ঝোড়ো বাতাসের প্রচন্ড তোড়ে জানালার পাল্লা সজোরে ধাক্কা মারল তাঁর হাতের উপর। উলটো ক'রে ধরা স্টীল কলমের 'জি নিব' তাঁর বুক বিদ্ধ করে। এই ছোটো আঘাতই ক্রমে দূষিত ঘা'য়ে পরিণত হয়। দু'বার অস্ত্রোপচার করেও কোনো ফল পাওয়া যায় না। ক্রমে এই ঘা বুকের হাড়ে পচন সৃষ্টি করে। ফলে সরকারি নির্দেশে তিনি স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন (১৮৯৬)। ত্রৈলোক্যনাথ কলমের খোঁচায় বিদ্ধ হলেও এবং পরবর্তীকালে তা মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়ালেও আমৃত্যু তাঁর রসবোধ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কলম নিঃসৃত হয়েই পাঠকের হৃদয়কে প্লাবিত করে চলেছে।

কর্মজীবনে গবেষণামূলক কাজের জন্য ত্রৈলোক্যনাথ দেশে বিদেশে নানা সুখ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর আসল-পরিচয় বাংলা সাহিত্যে উদ্ভট রঙ্গরসের উদগাতা হিসেবে, নিতান্ত শিশুকালেই ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে অনুরূপ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়,তিনি মাত্র নয় বছর বয়সেই কাঠ খোদাই এবং সেই সঙ্গে মাটির চাকতিতে মনগড়া সাংকেতিক বর্ণমালা উদ্ভাবন ক'রে নিজের খেয়ালী রচনা নিজেই ছাপতেন। তাঁর এই সাংকেতিক বর্ণমালাকে খানিকটা পিটম্যানের সাংকেতিক বর্ণমালার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। সংস্কৃত, ওড়িয়া, হিন্দী, ফার্সী, উর্দু, ইংরেজি প্রভৃতি সমস্ত ভাষায় তিনি মাতৃভাষা বাংলার মতোই পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ছড়িয়ে রয়েছে অবশ্য দু'টি ভাষায়— ইংরেজি ও বাংলায়।

ত্রৈলোক্যনাথ ইংরেজিতে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন,সেগুলি হলঃ—

১. A descriptive catalogue of Indian products (1883).
২. A Hand book of Indian products (Art manufacturers and Raw Materials) 1883.
৩. A list of Indian economic products (1884).
৪. Art manufacturers of India. (1888).
৫. A visit to Europe (1889).

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ত্রৈলোক্যনাথ যে সময় ইংরেজি গ্রন্থাদি রচনা করেন তখন তিনি কোনো বাংলা রচনায় হাত দেননি। তিনি বাংলাতেও খুব বেশির গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন না, তবে তা বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল, বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত উপন্যাস ও গল্পগুলি হলঃ—

১. 'কঙ্কাবতী' (উপকথার সচিত্র উপন্যাস, ১৪.৯.১৮৯২)।
২. 'ভূত ও মানুষ' (সচিত্র গল্প, ১৩.১.১৮৯৬)।
৩. 'ফোক্‌লা দিগম্বর' (সামাজিক উপন্যাস, ৪.৩.১৯০১)।
৪. 'মুক্তামালা' (উপন্যাস, ৭.১.১৯০১)।
৫. 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' (৩০.৯.১৯০৩)।

৬. 'ময়না কোথায়' (উপন্যাস, ১৬.১০.১৯০৪)

৭. 'মজার গল্প' (১৩.৪.১৯০৬)।

৮. 'পাপের পরিণাম' (উপন্যাস, ১০.৯.১৯০৮)।

৯. 'ডমরুচরিত' (গল্প, ১০.৮.১৯২৩)।

১০.'জন্মভূমি' (১৮৯২)।

৩রা নভেম্বর ১৯১৯ (১৭ই কার্তিক ১৩২৬), ৭৩ বৎসর বয়সে ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যু হয়।

ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পর 'ডমরুচরিত' প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন'- এর সম্পাদক কানাইলাল দে মহাশয়ের সহায়তায় ত্রৈলোক্যনাথ 'বিজ্ঞান শিক্ষা' নামে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সর্বশেষ রচনা 'বুড়ো সংসারের জঞ্জাল' বৃদ্ধ বয়সে মানুষ স্ত্রী-পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে কীরকম অবহেলার পাত্র হ'য়ে পড়ে তাই ছিল এই ছোট ব্যঙ্গ-রচনাটির বিষয়বস্তু। যদিও এই রচনা বর্তমানে পাওয়া যায় না, তবে সেকালের কোনো একটি সাময়িক পত্রে তা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা গেছে।

ঋণ স্বীকারঃ

১। বঙ্গভাষার লেখক (ত্রৈলোক্যনাথের আত্মজীবনী)/সম্পাদিত বঙ্গবাণী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত,কলকাতা,১৩১১

২। ত্রৈলোক্যনাথের কথাসাহিত্য চেনাজগৎ/কথাসাহিত্য চেনাজগৎ/ড.মানসী সেনগুপ্ত/অচেনা স্বাদ,কলকাতা,১৯৯৭

৩। ত্রৈলোক্যনাথ: কথাসাহিত্য ভাবনা/বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য/কলকাতা,২০০৫

৪। 'ত্রৈলোক্যনাথ: বাংলাসাহিত্যে ব্যাঙ্গরসের আদিস্রষ্টা' শীর্ষক প্রবন্ধ/উত্তমকুমার মিত্র/তথ্যকেন্দ্র/সুহাস তালুকদার সম্পাদিত/কলকাতা/ফেব্রুয়ারি,২০০১সংখ্যা

## ২.১(খ) বাংলা গল্পের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পটভূমিকায় হাসির গল্পের স্থানঃ ত্রৈলোক্যনাথের অবস্থান-নির্ণয়

মানুষের ব্যক্তি-জীবন ও আমাদের সমাজ জীবনের নানাবিধ অসঙ্গতি থেকেই হাস্যরসের উৎপত্তি। অসঙ্গতি যেহেতু আমাদের জীবনযাত্রায় অনিবার্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে, তাই হাসির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও ওতপ্রোত ও অঙ্গাঙ্গী। এই হাসিকে অবলম্বন করেই সাহিত্যের হাস্যরসের উৎপত্তি। পৃথিবীর সব দেশের সব সাহিত্যে গুরুগম্ভীর বা সীরিয়স বিষয়ের পাশাপাশি হাস্যরসেরও সমান্তরাল প্রবাহ সচেতন পাঠকের চোখে পড়বে। বাংলা সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চর্যাপদের 'বেঙ্গসংসার বড়হিল জা অ' পদাংশের দার্শনিক তাৎপর্য যাই-ই থাক না কেন, সাংসারিক নানা অসম্পত্তির চিত্র এক কৌতুকরসের সঞ্চার করে। কবিকঙ্কন মুকুন্দ-র ভাঁড়ু দত্ত বা 'রামাগণের পতিনিন্দা' অথবা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ কৃষ্ণনগরের রাস্তায় শিবের প্রকাশ্য লাঞ্ছনার বিবরণে এবং অন্যত্রও হাস্যরসের অনাবিল উৎসার। এঁদের ব্যক্তিগত জীবন দুঃখপূর্ণ ছিল বলেই হয়তো তাঁরা নিছক ভাঁড়ামির স্থূল মার্গে পদচারণা না ক'রে নির্মল ও বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তবে, মধ্যযুগ থেকে শুরু করে প্রাক্ বঙ্কিম পর্বের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের যে প্রবাহ আমরা লক্ষ্য করি, তার মধ্যে wit- জাতীয় হাস্যরস তো ছিলই না, এমনকি নির্মল ও বিশুদ্ধ হিউমারেরও অভাব ছিল। কারণ, হিউমার বা কৌতুকের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে স্থূলতা ও আদিরসের মিশ্রণ ঘটে গিয়েছিল। সুরুচিপূর্ণ বিশুদ্ধ হিউমার এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত উইট-এর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের প্রথম পরিচয় ঘটে বঙ্কিম-সাহিত্যেই। 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের বিভিন্ন রচনা গভীরভাব সমন্বিত বিশুদ্ধ ও নির্মল হাস্যরসের উজ্জ্বল নির্দশন।

বঙ্কিম-পরবর্তী যুগে এবং প্রাক-রবীন্দ্রপর্বে বাংলা কথাসাহিত্যের নানা শাখায় বহু বিচিত্র সমৃদ্ধি ঘটলেও হাস্যরস সৃষ্টিতে বাঙালি লেখকগণ বিশেষ উৎসাহ বোধ করেননি। এই মধ্যপর্বে 'ভারত উদ্ধার' কাব্যের কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু কয়েকটি রঙ্গ-ব্যঙ্গ প্রধান উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'কল্পতরু', 'ক্ষুদিরাম'-এর মতো দু'টি উপন্যাস, অন্যদিকে যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'মডেল ভগিনী' বা 'চিনিবাক্সচরিতামৃত'- এর মতো উপন্যাস সেকালে কিছুটা সাড়া জাগালেও, এঁদের দু'জনের রচনাই ছিল তীব্র ব্রাহ্ম-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, ফলত পক্ষপাতদুষ্ট ও আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত। সামাজিক অসঙ্গতিকে আক্রমণ করে লিখেও যে সেই রচনার হাস্যরচসের মধ্যে কৌতুকের স্নিগ্ধতা ও ব্যঙ্গের ঝাঁঝ- এর মধ্যে একটা ভারকসাম্য বজায় রাখা সম্ভব— তা এঁরা ক'রে দেখাতে পারেননি। ঠিক এই আংশিকতা ও বিদ্বেষপূর্ণ হাস্যরসের পটভূমিতেই হাস্যরসের স্রষ্টা হিসেবে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। পরশুরাম তাঁর সার্থক উত্তরসূরি।

বিশিষ্ট পাশ্চাত্য সমালোচক এমার্থন বলেছিলেন—

> "পৃথিবীতে যেমন তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল, তেমনি মানুষের জীবনেও তিনভাগই দুঃখ আর একভাগ মাত্র সুখ।"

একথা ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য। শৈশবের দারিদ্র, অনাহার, দুঃখ ইত্যাদিকে সঙ্গী ক'রে নিয়ে তিনি বড় হয়েছিলেন। ব্যক্তি-পরিচয় প্রসঙ্গে সে-কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। মানবকল্যাণ ও সমাজ হিতৈষণার আদর্শ নিয়েই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর গল্পগুলিতে হাস্যরস ও ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি। ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের মাধ্যমে স্বার্থান্ধ সমাজ ও ব্যক্তিকে আঘাতে - আক্রমণে বিদ্ধ করাই ছিল ত্রৈলোক্যনাথের উদ্দেশ্য।

শ্রদ্ধেয় সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যরসের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন—

> "রঙ্গ ও রসিকতার উপকরণে ত্রৈলোক্যনাথ আত্মসমালোচনা করেছেন, সেই আত্মনিরীক্ষার দর্পণে দেশের অনেক ভন্ডামি, অনেক মিথ্যাচার প্রতিবিম্বিত হয়েছে।"[১]

ব্যঙ্গ-শিল্পী বা satirist-এর লক্ষ্য কি?

বিশিষ্ট হাস্যরসস্রষ্টা পরিমল গোস্বামী এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে বলেছেন—

> "ব্যঙ্গ-স্রষ্টা সমাজের গোষ্ঠীর মধ্যে, যেখানে যে বিষয়ে অনাচার, অসঙ্গতি,চিন্তার জড়তা বা মূঢ়তা দেখেন,সেখানে তা তিনি ভেঙ্গে দেবার জন্য একটা প্রবল প্রেরণা অনুভব করেন। তাঁর মনোভাব অন্যায় ধ্বংসের মনোভাব। এটুকুই তাঁর দায়িত্ব।"[২]

ঊনিশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নতুন ধরনের হাস্যরসের সৃষ্টি ত্রৈলোক্যনাথের হাতেই। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের বহমান ধারায় রসস্রষ্টা হিসেবে ত্রৈলোক্যনাথের স্থান কোথায়, তাঁর স্বাতন্ত্র্যই বা কেমন, তাঁর সৃষ্ট ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের প্রকৃতি কেমন, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা রচনাই বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের অভিষ্ট।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রকাশিত গ্রন্থ মোট আটটি। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) এবং সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'ডমরুচরিত' (১৯২৩)। কর্মজীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসে তিনি সাহিত্যচর্চায় অবতীর্ণ হন। 'কঙ্কাবতী' প্রকাশিত হয় তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের সামান্য পূর্বে। বাকি গ্রন্থগুলি তিনি লিখেছিলেন অধিকাংশই তাঁর অবসর গ্রহণের পরবর্তী জীবনে, যখন তাঁর হাতে প্রভূত জীবনাভিজ্ঞতার সঞ্চয়,ব্যবহার করার মতো পর্যাপ্ত সময়।

খাঁটি গল্প সংকলন হিসেবে ত্রৈলোক্যনাথের চারটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য— 'ভূত ও মানুষ', 'মুক্তামালা', 'মজারগল্প' ও 'ডমরুচরিত'। 'ভূত ও মানুষ'এর মধ্যে আবার চারটি পৃথক গল্প অন্তর্ভুক্ত— 'বাঙ্গাল নিধিরাম', 'বীরবালা' 'লুল্লু' ও 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কঙ্কাবতী' আসলে একটি অভিনব আস্বাদের উপন্যাস। এছাড়াও তিনি আরও চারটি উপন্যাস লিখেছিলেন। প্রথম উপন্যাসেই ('কঙ্কাবতী') তিনি ব্যঙ্গ-কৌতুকের সঙ্গে উদ্ভটরস বা ফ্যান্টাসির মিশ্রণ ঘটিয়ে এমন অদ্ভুত ও বিচিত্র এক আস্বাদনের জগত নির্মাণ করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত তা মুগ্ধ করেছিল।

ঊনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গের ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের এ-জাতীয় রচনাগুলির নিবিড় পাঠই প্রমাণ করবে যে, বিশেষ উদ্দেশ্যবোধের তাড়নাতেই তাঁরা ব্যঙ্গের শরণ নিয়েছিলেন। ব্যঙ্গের কুঠার দিয়েই তাঁরা সমাজের দুষ্ট ব্যাধিকে নিরাময় করতে চেয়েছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথও এই ধারার ব্যতিক্রম নন। সেকালের সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় ভন্ডামি, মধ্যবিত্ত মানুষের অপরিসীম অর্থলিপ্সা, ক্ষমতাবান শ্রেণীর অন্যায়-অত্যাচার, কাপুরুষতা ও পরানুকরণ, প্রথা মান্য করার জন্য ও মানানোর জন্য নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা, কুসংস্কারের সর্বগ্রাসী প্রভাবের বিরুদ্ধেই ত্রৈলোক্যনাথ লেখনী ধারণ করেছিলেন। সেজন্য, স্পষ্টভাবে বলতে দ্বিধা নেই যে, ত্রৈলোক্য-সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক। তবে, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সাহিত্যে যে গঠনগত শৈথিল্য বা তাৎক্ষণিক উত্তেজনার আতিশয্য থাকা সম্ভব, সেই ত্রুটি থেকে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি মুক্ত (যদিও তাঁর উপন্যাসগুলিতে এ-জাতীয় ত্রুটি একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়)। তবে, উদ্দেশ্যমূলকতার সঙ্গে যেহেতু উচ্চগ্রামে পরিবেশনের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে তাই ত্রৈলোক্যনাথের কিছু লেখায় প্রচারধর্মিতার ত্রুটিও প্রকট হ'য়ে উঠেছে।

অধ্যাপিকা ব্রততী চক্রবর্তী এ'প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "সে কোনো ব্যঙ্গ-সাহিত্যই উদ্দেশ্যমূলক রচনা। মানুষের যতপ্রকার দোষ-ত্রুটি-বিচ্যুতি- অসংগতি রয়েছে ব্যঙ্গ লেখকেরা সেসবের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন এবং তার সংশোধনের একটা ইচ্ছাও থেকে যায়। তাই সেখানে প্রচারধর্মিতাও এসে পড়ে। ত্রৈলোক্যনাথেও সেই প্রচারধর্মিতা এসেছে। তাঁর সাহিত্যে মানুষের বাসোপযোগী সুস্থ-স্বাভাবিক সমাজ নির্মাণের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রবল উদ্দেশ্যমূলকতা কখনও কখনও (ময়না কোথায়, পাপের পরিণাম, রূপসী হিরন্ময়ী প্রভৃতি) শিল্পসৃষ্টির ক্ষতি করেছে, আবার কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, মুক্তামালা, ডমরুচরিত-এ এই প্রচারধর্মিতা শিল্পসৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে রচনাগুলিকে বিশিষ্ট শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। উদ্দেশ্যমূলকতা যেখানে প্রবল, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতাও সেখানে প্রখর।"[৩]

সুতীব্র ব্যঙ্গরসে ভরপুর গল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো কঙ্কাবতীর তনু রায় ও ষাঁড়েশ্বর, 'মুক্তামালা' সিরিজের গুরুদেব-প্রসঙ্গও এখানে উল্লেখযোগ্য। আবার নীতিবোধের তাড়না থেকে মুক্ত হ'য়ে নিছক নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে স্মরণ করা যেতে পারে লুল্লু, নয়নচাঁদ বা ডমরুধরের গল্পগুলির কথা। এসব গল্পে ব্যঙ্গ যে কোথাও নেই এমন নয়, তবে তা প্রাগুক্ত গল্পগুলির মতো তীব্রভাবে আক্রমণাত্মক নয়।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের রসাবেদনের অভিনবত্ব বা অনন্যতার আর এক মূল ভিত্তি হলো উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য সব ঘটনার সমাহার। যাকে আমরা ফ্যান্টাসি বলতে পারি, আবার কেউ কেউ একে ম্যাজিক রিয়ালিজম'ও বলতে চান।

সমালোচক পবিত্র অধিকারী এ'প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "....মূল্যবোধ বা নীতিবোধের সঙ্গে বাস্তবজীবনের অসামঞ্জস্যতা দেখে পরিহাসে বিদ্রুপে তিনি আবহকাল বাহিত রূপকথার শৈলীকেই প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন। যে আদর্শ বাস্তবতা আমাদের কাম্য কিন্তু অনুপস্থিত তাকে ভূতপ্রেত আমদানি করে, অলৌকিকত্ব আরোপ করে কিছুটা কৌতুককর অতিরেক দিয়ে যুগবলয়ের বাইরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তিনি। ফলে ম্যাজিক রিয়ালিজমের ছোঁয়ায় তাঁর রচনার কৃৎকৌশল একটা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল।"[৪]

উদ্ভট ঘটনা বা রূপকথামিশ্রিত ফ্যান্টাসির আশ্রয়ে সমকালের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানের কথা ভেবেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁর হাসির গল্পের সমাজবীক্ষা প্রসঙ্গে এই সূত্রটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শুধুমাত্র ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ বা নির্মল কৌতুকের মধ্যেই তিনি তাঁর সামাজিক বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেননি। 'কঙ্কাবতী'তে যেমন রূপকথার আমেজ, তেমনি 'মুক্তামালা'র এগারটি গল্পমালায় উদ্ভট কল্পনা বা ফ্যান্টাসির সমাহার। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বৃদ্ধ মানুষের ভূমিকম্প বিক্রয়,মৃত্যুর পর জলের কলসে রূপান্তরিত হওয়া, বড়োমাপের মুক্তাসহ প্রকাণ্ড ঝিনুকের পেটে দীর্ঘদিন বাস করা, লাউমুখী ও নারিকেলমুখী দুই ডাকিনীর মানুষের মুন্ড দিয়ে ভাঁটা খেলা, চলন্ত গাছের মজাদার বর্ণনা ইত্যাদি। 'ডমরু চরিত'-এর গল্পমালায় এই জাতীয় উদ্ভট কল্পনা তথা ফ্যান্টাসি-জাতীয় ঘটনার ছড়াছড়ি। যেমন, 'গাছে ঝোলা সাধু' গল্পে ডমরুধরের মর্ত্যশরীরে গাছে ঝোলা সাধু-র বিস্ময়করভাবে সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ, সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে পাখির মতো বড় বড় রক্তচোষা বিষাক্ত মশার উপদ্রব ও তাদের নিধনের বিচিত্র পন্থা, 'চঞ্চলার গাই গরু, গল্পে দুর্ঘটনায় দ্বিধাবিভক্ত গরুর শরীরের নিম্নভাগের সঙ্গে ডমরুর কাটা মুন্ড জুড়ে গিয়ে এক বিচিত্র রসলোকের সৃষ্টি দেবসেনাপতি কার্তিকের ময়ূরের ওপর ভর ক'রে ডমরুর আকাশমার্গে ভ্রমণ,বেকায়দায় প'ড়ে গাত্রত্বক বা ছাল ফেলে রেখে মাংসের বাঘের পলায়ন প্রভৃতি ঘটনা। সর্বাধিক অবিশ্বাস্য অথচ কৌতুককর (আবার একে ফ্যান্টাসির চূড়ান্ত স্তরও বলা যায়) ঘটনা হলো কুমীরের পেটের ভিতরে বসে জীবন্ত অবস্থায় সাঁওতাল রমণীর বেগুন বিক্রয়ের বর্ণনা—

> "বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা, কুমীরের পেটের ভিতর দেখি না যে সেই সাঁওতাল মাগী, চারিদিন পূর্বে কুমীর যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই মাগী পূর্বদেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুনের ঝুড়িটি সে উপুড় করিয়াছে, সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুন বেচিতেছে।"[৫]

বলা বাহুল্য, হাস্যরস এখানে নির্বাধ এবং উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। বলা প্রয়োজন যে, ডমরুধর নিজেকে আরব্যরজনীর জিনের সমকক্ষ বলে মনে করেছে কারণ সে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিলোকে অবাধে বিচরণ করতে পারে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ডমরুকে কেন্দ্র ক'রে ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যরসাত্মক উদ্ভট কল্পনা এবং তার আশ্রয়ে সামাজিক বক্তব্য মুখর হ'য়ে উঠেছে।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে (এবং উপন্যাসেও) ভূত-প্রেতের সমাহার প্রচুর। কিন্তু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভূতেরা একেবারেই ভয় দেখা বার জন্য আবির্ভূত হয় না, বরং অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজের বাঁকাচোরা মানুষদের ক্যারিকেচার বা বিদ্রূপাত্মক প্রতিনিধি হিসেবেই ভূতেদের আনাগোনা তাঁর গল্পে। ভূত পিষে তেল তৈরি, যেথা সেথা যথেচ্ছ যাবার জন্য ভূতেদের নাগরা জুতো, সাংবাদিক ভূত, ইংরেজিশিক্ষিত ইঙ্গ-বঙ্গ ভদ্র সমাজের নব্যসভ্য ভূত প্রভৃতি ঘটনা ও বর্ণনাগুলি লেখকের সুনির্দিষ্ট সমাজবীক্ষার ফলশ্রুতি। ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষার স্বরূপ বা তাঁর দূরপ্রসারী মননের গভীরতা টের পাওয়া যায় ভূত তৈরির এই অভিনব প্রস্তাবে—

> "এখানে এখন একটি নূতন কথা উঠিল। বিজ্ঞানবেত্তারা- বিশেষতঃ ভূত-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা— এ বিষয়টি অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। এখানে স্থির হইল এই, যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবরা করিতে পারেন না? অন্ধকার অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পুড়িয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব সস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। সস্তা হইলে গরীব-দুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।"[৬]

কিন্তু কলোনিয়াল সমাজে তা যে সহজে হবার উপায় নেই, সেকথাও ত্রৈলোক্যনাথ ভালোই জানেন। উপনিবেশের সমাজে মানুষের তো বটেই,এমনকি ভূতেদেরও স্বাধীন বিচরণ বৃটিশ রাজশক্তির ইচ্ছাধীন।ত্রৈলোক্যনাথের সমাজবীক্ষা এখানে হাস্যরসের ছদ্মবেশে উপনিবেশের সমাজের হতাশা ও যন্ত্রণাকে হাজির করেছে—

> ".....ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে।"[৭]

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভূতপ্রেতের প্রসঙ্গ কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তার সাহিত্যিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ ক'রে সমালোচক ব্রততী চক্রবর্তী বলেছেন—

"এইসব ভূতেরা মানুষেরই প্রতিনিধি।.... যুক্তিবাদী ত্রৈলোক্যনাথ নিজে ভৌতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভৌতিক আবহাওয়া সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, লৌকিক রসই তিনি পরিবেশন করেছেন। তাঁর সৃষ্ট ভূতেদের স্বভাব ও আচরণে মানবসমাজেরই কৌতুককর বিসদৃশতা বা বিকৃতি তুলে ধরেছেন তিনি। গোঁগাঁ ভূতকে সংবাদপত্রের সম্পাদক করে রুচিহীন মিথ্যাশ্রয়ী সাংবাদিকতাকেঠাট্টা করেছেন। ভারতীয় ভূতের কাঁচা ধর্মের প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজে বিলাতযাত্রাজনিত জাতিচ্যুতির ভয়কে উপহাস করেছেন। থিয়েটারী ভূত, ভূততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও অন্যান্য ভৌতিক প্রসঙ্গগুলিতেও মানুষের অসংগতিকেই সকৌতুকে ব্যঙ্গ করেছেন। অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ভূতপ্রেতের জগতের হাস্যরসাত্মক কাহিনীগুলি তাঁর স্বকীয় মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তিরই পরিচায়ক।"[৮]

ধর্ম নিয়ে ব্যবসা, সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের দুর্বলতাকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার ক'রে ধর্মব্যবসায়ীদের চমকপ্রদ মুনাফা অর্জন ত্রৈলোক্যনাথের অনেক গল্পেরই ব্যঙ্গের বিষয়। তাছাড়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে যে নানাবিধ লোকঠকানো ব্যবসার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, অনেকে এই সুযোগে দু'পয়সা গুছিয়েও নিয়েছিল; সেই রূঢ় বাস্তবতাও ত্রৈলোক্যনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। 'স্বদেশী কোম্পানী', গল্পে সেই প্রতারণা, ছলচাতুরী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহজে বড়লোক হবার বাসনা বর্ণিত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পমালায় 'স্বদেশী কোম্পানী' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে। হাস্যরস এখানে ব্যঙ্গ-আশ্রয়ী এবং ব্যঙ্গ এখানে ভর্ৎসনা ও অনুশাসনধর্মী।

'ডমরুচরিত'-এর পঞ্চম গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদ 'স্বদেশী কোম্পানী'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে ফাটকাবাজি ও লোকঠকানো ব্যবসা শুরু হয়েছিল, সেই বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। 'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পটি। 'স্বদেশী কোম্পানী' লোক ঠকানোর কাহিনী। এর নায়ক ডমরুধর। প্রথমবার এ-জাতীয় কোম্পানী খুলে ডমরুধর লোক ঠকিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। প্রাথমিক সাফল্যে প্রলুব্ধ হ'য়ে দ্বিতীয়বার শংকর ঘোষকে সঙ্গী ক'রে 'গ্র্যান্ড স্বদেশী কোম্পানী লিমিটেড' নামে কোম্পানী খুলে বড়লোক ও পেশাদারী বক্তাকে ডিরেক্টর ক'রে ইংরেজি ও বাংলায় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বলা হলোঃ কোম্পানী এঁটেল মাটি দিয়ে কাগজ তৈরি ক'রে বাজারে ছাড়বে। আরও বলা হলোঃ ১০০ টাকা শেয়ার হোল্ডারদের ২৫ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হবে। প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে সাধারণ মানুষ কতখানি নির্বোধ হ'য়ে ওঠে তা দেশবাসীর কথায় স্পষ্ট হলো—

"সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কলিকাতার বাঙালীরা একদিন সন্ধ্যাবেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।"[৯]

এঁটেল মাটি দিয়ে যে কাগজ তৈরি করা যায় না, এই বুদ্ধিটুকুও, গল্পে হাস্যরস আমদানীর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী, সেকালের দেশবাসীর মধ্যে লোপ পেয়েছিল। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গের চাবুক এখানে নির্মম। এঁটেল মাটি দিয়ে কাগজ তৈরি করা যায় না তা নির্বোধ শেয়ার হোল্ডারদেরও অজানা ছিল। ডমরুধর সেই অজানাকেই কাজে লাগিয়েছে। ডমরুধরের সবটাই যে বিপুল পরিকল্পিত প্রতারণা তা দ্রুত প্রমাণিত হয় কোম্পানীর লাটে ওঠায়, শেয়ারহোল্ডারদের টাকা আত্মসাৎ করায়, শংকর ঘোষকে ঠকানোর মধ্যে। সাধারণ মানুষের অসচেতনতা ও প্রতিরোধহীনতা প্রতারণার ব্যবসাকে কতদূর বিস্তৃত করতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডমরুধরের দু'দু'বার স্বদেশী কোম্পানী খোলার ঘটনায়।

এইরকম আর একধরনের লোকঠকানো ব্যবসার গল্প হলো 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' ('ভূত ও মানুষ'- এর চতুর্থ গল্প)। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় দুর্বলতাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার ক'রে নয়নচাঁদের যে বিচিত্র ব্যবসা গড়ে উঠেছিল, তা শেষপর্যন্ত কিছু আজগুবী বা ফ্যান্টাসিকে আঁকড়ে ধরেছে— তা গল্পের রসাস্বাদকেই বাড়িয়ে তুলেছে। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ এখানেও, ক্ষুরধার, তবে তার সঙ্গে কিছু হিউমারের মিশ্রণ ঘটেছে।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে বরাবরই একটা মজলিশী মেজাজ অনুভব করা যায়। যাকে বলা যায় 'আড্ডার গল্প'— ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গল্পেই সেই সুর। সেজন্য তাঁর গল্পের ভূত-প্রেত বা আজগুবী ঘটনামালাকে আড্ডার পরিবেশে খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না। এই ধরনের গল্পগুলি সরস হয়েও নির্দোষ। বাংলা সাহিত্যে এমন নির্দোষ রসিকতা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। মজলিশী ঢঙে গল্প বলা হয়েছে ব'লে গল্পের আয়তন এমনিতেই কিছুটা বেড়ে গেছে; ক্ষেত্রবিশেষে ছোটগল্পের প্রত্যাশিত শৈল্পিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে গেছে। গল্প যে কখন 'কাহিনি' হ'য়ে উঠেছে, সেদিকে স্বয়ং লেখকেরও হয়তো খেয়াল ছিল না।

আর এজন্যই ত্রৈলোক্যনাথকে 'গল্পলেখক' অপেক্ষা 'গল্পকথক' বলা অধিকতর সঙ্গত। তাঁর গল্পগুলির নিবিড় পাঠথেকে তাঁর কথনভঙ্গির যে কাঠামোটি পাওয়া যায়, তাতে বোঝা যায় যে, মনে মনে তিনি একটি অদৃশ্য মজলিশ কল্পনা ক'রে নিয়েছেন এবং সেই বৈঠকী মজলিশের উদ্দেশ্যেই তিনি গল্পটি বলে চলেছেন। একটানা একপক্ষীয় (monotonous) কথন নয়, তার মধ্যে 'অপর' (other)-এর অংশগ্রহণ, অর্থাৎ কথোপকথন এর একটা আভাস ফুটে ওঠে এবং এই কথোপকথনের ভঙ্গিটি কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না। যে-সময়ে তিনি তাঁর মৌলিকতার দ্যোতক গল্পগুলি লিখেছেন, তখন বঙ্কিম-প্রতিভা অস্তমিত এবং রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-র প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলি সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর মৌলিক বিষয় (content) ও কথনভঙ্গি সম্পর্কে এত টাই দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ কোনো লেখকই তাঁকে প্রভাবিত করেননি। অর্থাৎ রবীন্দ্র-যুগে আবির্ভূত হলেও প্রতিভার মৌলিকতায় ত্রৈলোক্যনাথ স্বতন্ত্র স্থান অধিকার ক'রে আছেন। আজও পর্যন্ত তাঁর মৌলিকতার সেই স্থান চির-অম্লান।

উল্লেখপঞ্জিঃ


১. দ্র. 'বাংলা' গল্পবিচিত্রা—১৩৭৮

২. দ্র. 'আধুনিক ব্যঙ্গ-পরিচয়'

৩. দ্র. 'ত্রৈলোক্যনাথ ও বাংলা সরস গল্পের ঐতিহ্য'/ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ও জ্যোতিপ্রসাদ রায় সম্পাদিত 'ছোট গল্প ঃ বিকাশ পরিণতি ও উপলব্ধি' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধ, পৃঃ২-৪

৪. দ্র. 'ত্রৈলোক্যনাথের গল্প'/ অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গল্পগুচ্ছ' পত্রিকার অক্টোবর, ২০০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ/ পৃঃ ২০৬

৫. দ্র. 'ডমরুচরিত'/ অষ্টম পরিচ্ছেদঃ 'কুম্ভীর বিভ্রাট'/ ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী/ সুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত অখন্ড সংস্করণ, ১৪১০/ পৃঃ-৪৮৩

৬. দ্র. লুল্লু / চতুর্থ অধ্যায়ঃ উদ্যোগ/ ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী/ তদেব/ পৃঃ-১৬

৭. দ্র. 'লুল্লু'/ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ রোজা/ তদেব/ পৃঃ ১২

৮. দ্র.৩-এর অনুরূপ / পৃঃ- ৫

৯. দ্র. 'ডমরুচরিত'/ পঞ্চম গল্প/ প্রথম পরিচ্ছেদ/ ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী/ পৃঃ- ৫১৬



LIBRARY NBU. DARJEELING

261460

18 AUG 2013

## ২.২(ক)পরশুরামঃ সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি-পরিচয় ও গ্রন্থ-পরিচয়

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ মঙ্গলবার বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের সন্নিকটস্থ বামুনপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে পরশুরামের জন্ম। পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী উলা বীরনগর। তাঁর পূর্বপুরুষ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্বে সেখানকার মহাপ্রতাপান্বিত মুস্তৌফী বংশের মেয়েকে বিবাহ ক'রে সেই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

বাবা চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩-১৯১৩) অল্প বয়সে নিঃসন্তান প্রথমা পত্নীর বিয়োগের কয়েক বছর পর হাওড়া জেলার সুপুরিয়ার কাশীশ্বর মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি একটি কন্যাসন্তান রেখে মারা যাওয়ার পর পুনরায় বর্ধমান জেলার বামুনপাড়া গ্রামের নৃত্যগোপাল দত্ত ও জগমোহিনী দত্তের কন্যা লক্ষ্মীমণিকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স তিরিশ। চন্দ্রশেখর-লক্ষ্মীমণির পুত্রকন্যারা হলেন যথাক্রমেঃ ইন্দুমতী (পরে দত্ত), কুমুদবতী (পরে মুস্তৌফি), শশিশেখর, উষাবতী (পরে সোম), লীলাবতী (পরে ঘোষ), রাজশেখর, হিরণ্যবতী (পরে দত্ত), কৃষ্ণশেখর, গিরীন্দ্রশেখর।

চন্দ্রশেখর বসু সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁর রচিত 'বেদান্ত প্রবেশ', 'বেদান্ত দর্শন', 'সৃষ্টি', 'অধিকারতত্ত্ব' 'প্রলয়তত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ সেকালে খ্যাতি লাভ করেছিল।

চন্দ্রশেখর সামান্য অবস্থায় জীবন সংগ্রাম শুরু করেন। তবে তাঁর যোগ্যতার গুণে দ্রুত উন্নতির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। কর্মজীবনের প্রথমে তিনি সামান্য একজন ডাকবিভাগের কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তী কালে চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গার রাজ এস্টেটের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হন। রাজশেখরের বাল্যকাল পিতার কর্মসূত্রে বাংলার বাইরেই কেটেছে। প্রথম সাত বছর তিনি মুঙ্গের জেলার খরগপুরে ছিলেন। পিতার সংযম-শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠার দ্বারা তাঁর পুত্রেরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর নিজে ছেলেদের হস্তলিপি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতেন। পরে বড় হয়েও তারা বাল্যকালের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করেননি। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রেও তাঁরা সেই ধারা বহন করে চলেছেন।

শৈশব থেকেই রাজশেখরের সব বিষয়েই অদম্য কৌতূহল ছিল। উপহার পাওয়া, যে কোনো খেলনা হাতে পেলেই— লোহা, পাথর কিংবা হাতুড়ি দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটি ভেঙে দেখতেন তার মধ্যে কী আছে, কেন সেটা ঘোরে, কেনই বা সেটা বাজে।

১৮৮৮ সালে দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুলে হন রাজশেখর। তিনিই তখন সে স্কুলের একমাত্র বাঙালি ছাত্র। এই বয়স থেকেই তিনি মাছ-মাংস খাওয়া ত্যাগ করেছিলেন ঘৃণায়, ইঁদুর কলে পড়লে ছেড়ে দিতেন, মারতেন না।

১৮৯৩ সালে রাজশেখরের দু'একটি ইংরাজি লেখা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকায়। 'দি টিউবওয়েল' নামে একটি রচনার কথা শশিশেখর স্মরণ করেছেন।

১৮৯৫ সালে চৌদ্দ বছর ন'-মাস বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুল থেকে।

১৮৯৭ সালে রাজশেখর পাটনা কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ (ফাষ্ট আর্টস্) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ওই কলেজে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পাটনা কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে আরও জনদশেক বাঙালী ছাত্র পড়ত। মাঝে মাঝে বাঙালি ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাও হত।

১৮৯৭ সালে শ্যামাচরণদে-র পুত্র যোগেশচন্দ্র-র কন্যা মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে রাজশেখর বসু বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

১৮৯৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে অনার্সসহ স্নাতক হন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু-র কাছে কিছুদিন পড়ার সুযোগ পান। সে সময় কলাশাখায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। রাজশেখরের সহপাঠী ছিলেন শরৎচন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ শেঠ প্রমুখ।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রাজশেখর বসু রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সে বছর কেউ প্রথমবিভাগ পায় নি।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে একমাত্র সন্তান প্রতিমার জন্ম।

১৯০২-এর ১৬ই মে পিতা চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এইসময়েই রিপন কলেজ থেকে রাজশেখর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে মাত্র তিনদিনের জন্য আদালতে গিয়েছিলেন। সে কাজ পছন্দ না হওয়ায় তিনি বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁর শিক্ষক, প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর কাছে কোনো নিরুদ্বিগ্ন শান্তিপূর্ণ কাজে নিয়োগের আশা প্রকাশ করলে তিনি তাঁকে বেঙ্গল কেমিক্যালের কেমিস্টের পদে বহাল ক'রে দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে রাজশেখরের সাক্ষাৎ হয় এই উপলক্ষে। তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের কার্যালয় ছিল সার্কুলার রোডে।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে এক বছর কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালে ম্যানেজার পদে উন্নীত হন রাজশেখর। তার সুযোগ্য পরিচালনায় বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

রাজশেখর প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজ বাংলায় করার ব্যবস্থা করেন, এমনকী হিসাব রাখার কাজও। উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারের নামকরণে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার ব্যবহার ছাড়াও বিজ্ঞাপনের কথা ও রূপচিত্রণে নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মানিকতলার কারখানার প্রধান তোরণে সর্বভুক গরুড়মূর্তি স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছিলেন।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে রাজশেখর বসু বেঙ্গল কেমিক্যালের সর্বময় কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি সক্রিয়ভাবে পরিষদের বিভিন্ন কাজে যোগ দেন। তিনি শুধু পরিষদের সভ্য নন, ফ্যাকালটি অফ সায়েন্স এবং ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যানুফ্যাকচার ও কর্মাসের বোর্ড অফ্ স্টাডিজ-এর সদস্য হয়েছিলেন।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে পিতা চন্দ্রশেখরের প্রয়াণ ঘটে।

১৯১৯ বা এর সামান্য কিছু আগে-পরে ১৪ নম্বর পার্শিবাগান-এর পৈতৃক বাসভবনে বর্তমান বর্ষ কিংবা কিছুকাল পূর্ব থেকে 'উৎকেন্দ্রিক সমিতি'র নিয়মিত আড্ডার সূত্রপাত। এই আড্ডার ঠিকানাই তাঁর রচিত গল্পে ১৪ নম্বর হাবশীবাগান নামে পরিচিতি পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ক্যালকাটা আরবিট্রারি ক্লাবের ইংরেজি নামে সকলের আপত্তি হওয়ায় রাজশেখর সকলের অনুরোধে বাংলায় নামকরণ করেন 'উৎকেন্দ্রিক সমিতি'। এই আড্ডায় যোগ দিতেন জলধর সেন, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সত্য রায়, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। রাজশেখরের গল্পগুলির বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চিরকুমার যতীন্দ্রকুমার সেন ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। তাঁর হাতে তৈরি চা আড্ডার উপভোগ্য উপকরণ ছিল। এছাড়া শশিশেখর, গিরীন্দ্রশেখর কলকাতায় এলে কৃষ্ণশেখর এই আড্ডায় যোগ দিতেন, মাঝে মাঝে আসতেন যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিরজাশংকর গুহ, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পী পুলিনচন্দ্র কুন্ডু প্রমুখ।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে 'পরশুরাম' নামে রাজশেখরের গল্পকার হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই বছরেই ভারতবর্ষ পত্রিকায় (১৩২৯ মাঘ) 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের প্রকাশ। এই গল্পের সুবাদেই তিনি প্রভূত জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যেও 'পরশুরাম' নামটি স্থায়ী স্মরণযোগ্যতায় মুদ্রিত হ'য়ে যায়।

১৯২২-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৩২৯ ফাল্গুন) 'মহাবিদ্যা' গল্পের প্রকাশ।

১৯২৩ এর অক্টোবর মাসে ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত উলা বীরনগরে উন্নয়নকর্মে, বিশেষত ম্যালেরিয়া দূরীকরনের জন্য বীরনগর পল্লীমন্ডলী সংগঠিত হয়। কৃষ্ণশেখর এই সংস্থায় অবৈতনিক সম্পাদক এবং গিরীন্দ্রশেখর মুখ্য চিকিৎসা-উপদেষ্টা রূপে দায়িত্ব গ্রহন করেন রাজশেখর এই পল্লীমন্ডলীর আজীবন সদস্য ছিলেন।

এই বছরেই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৩৩০ কার্তিক) 'চিকিৎসা সঙ্কট' এবং'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৩৩০ ফাল্গুন) 'ভুশন্ডীর মাঠে' গল্পের প্রকাশ। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৩৩১ কার্তিক)'লম্বকর্ণ' গল্পের প্রকাশ। তাঁর জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

১৯২৪ (১৩৩১) এ তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হয়। বিস্তারিত সূচি এইরকম—

গড্ডলিকা,-পরশুরাম। (শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত);

সূচিঃ শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, চিকিৎসা সংকট, মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ, ভুশন্ডীর মাঠে।

১৯২৮-এর ১৫ই মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সস্ত্রীক ভ্রমণ। ১৯২৮-এ (১৩৩৪) প্রকাশ পায় তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'কজ্জলী'।

এর বিস্তারিত সূচি—বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, দক্ষিণ রায়, কচিসংসদ, উলট-পুরাণ।

১৯২৯-এর ২৪শে নভেম্বর, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ এর ৮ই অগ্রহায়ণ 'রবিবাসর' প্রতিষ্ঠিত হ'লে রাজশেখর তার অন্যতম সদস্য হন।

১৯৩০ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'চলন্তিকা' প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ঃ সুধীরচন্দ্র সরকার,১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। (১৯৩০/ ১৩৩৭)

১৯৩১-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ 'চলন্তিকা' পেয়ে রাজশেখরকে পত্র লেখেন। তিনি তখন সুকিয়া স্ট্রীটে বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকতেন। এই পত্র পাঠ ক'রে ১৮ই,ফেব্রুয়ারি রাজশেখর ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা (প্রকাশকের ঠিকানা)

থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন — "অভিধান পেয়ে আপনি স্বহস্তে যে চিঠি লিখেছেন তাতে ধন্য হয়েছি। বাংলা শব্দের বানান সম্পর্কে আপনার এখনকার মতামত কি তা জানবার জন্য আমার কৌতূহল ছিল। আপনার হাতের লেখা যখনি দেখবার সুযোগ হয়েছে তখনই তা থেকে আপনার বানানের রীতি বার করবার চেষ্টা করেছি। এখন আপনার চিঠিতে আপনার মতের আভাষ পেলাম।"[১]

১৯৩৩-এর ১লা জানুয়ারী দীর্ঘ তিরিশ বছর একটানা কাজ করার পর রাজশেখর বসু বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে অবসর গ্রহণ করেন। এইসময়েই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন বাৎসরিক মেয়াদে।

১৯৩৪ এর-১৫ই এপ্রিল রাজশেখরের জীবনে যুগ্ম শোকের আঘাত নেমে আসে। এইদিন কন্যা প্রতিমার মৃত্যু— আবার সেদিনই তিন ঘন্টার ব্যবধানে বিদ্বান ও গুণবান জামাতা অমরনাথ পালিতের মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের অবসান ও লোকান্তর ঘটে। এরপর একই চিতায় একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর দেহ দাহ করা হয়। স্থিতধী রাজশেখর এই মর্মন্তুদ ঘটনা শান্ত মনে গ্রহণ করেছিলেন, পরের দিন ভোরে সদ্য পিতৃমাতৃহীনা দৌহিত্রী আশার হাতে দৈনন্দিন নিয়মিত কাজের অবসরে রচিত "সতী" কবিতাটি তুলে দিয়ে বলেছিলেন; "লেখাপড়া নিয়ে থাক। বিদ্যার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই।"

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত 'পরিভাষা ও বানান সমিতি'র সভাপতি পদে বৃত হন। এর অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বেতনভূক সহকারী সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত বানানের নিয়মাবলী 'চলন্তিকা' তৃতীয় সংস্করণে (২০শে মে, ১৯৩৬) অংশে সংযোজিত হয়।

এই বছরেরই ২৬ শে সেপ্টেম্বর লাইনো টাইপ কোম্পানীর শোরুমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা লাইনো টাইপ যন্ত্রের কর্মারম্ভের উদ্বোধন করেন। এই টাইপের উদ্ভাবক সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে রাজশেখর সহায়তা করেছিলেন।

১৯৩৭-এ পরশুরামের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' (যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত ১৩৪৪) প্রকাশিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ—প্রকাশকঃ এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাঃ লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। বৈশাখ ১৩৪৪। পৃঃ ১৫৯। দামঃ দেড় টাকা। সূচিঃ 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৩৩৭); 'পুর্ণমিলন' (১৩৩৬), 'উপেক্ষিত, (১৩৩৬) 'উপেক্ষিতা' (১৩৩৬), 'গুরুবিদায়' (১৩৩৭), 'মহেশের মহাযাত্রা'— 'রাতারাতি' (১৩৩৬-৩৭), 'প্রেমচক্র' (১৩৩৯)। দ্বিতীয় সংস্করণে দু'টি গল্প সংযোজিত হয়, 'দশকরণের বাণপ্রস্থ' (১৩৪৯), 'তৃতীয় দ্যূতসভা' (১৩৫০)।

১৯৩৯-এ রাজশেখরের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়— 'লঘু গুরু'। এর বিস্তারিত বিবরণ - প্রকাশক রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। আষাঢ় ১৩৪৬। পৃঃ ১১৪। দামঃ এক টাকা।

সূচিঃ নামতত্ত্ব (১৩৩০), ডাক্তারি ও কবিরাজি (১৩৩১), ভদ্রজীবিকা (১৩৩২), রস ও রুচি (১৩৩৪), অপবিজ্ঞান (১৩৩৬, ঘনীকৃত তৈল (১৩৩৭), ভাষা ও সংকেত (১৩৩৮), সাধু ও চলিত ভাষা (১৩৪০), বাংলা পরিভাষা (১৩৪০) , সাহিত্য বিচার (১৩৪১)। দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৩৫৬। তৃতীয় সংস্করণ- ১৩৬৯। নতুন সংযোজন; খ্রীস্টীয় আদর্শ (১৩৪৯) , ভাষার বিশুদ্ধি (১৩৫০), তিমি (১৩৪৯), প্রার্থনা (১৩৫০), সংকেতময়-সাহিত্য (১৩৫০), বাংলা বানান (১৩৫১), বাংলা ছন্দের শ্রেণী (১৩৫২), রবীন্দ্র পরিবেশ (১৩৫৫)।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে গিরীন্দ্রশেখরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সাইকো অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন এবং মনোব্যাধি গ্রস্তদের নিরাময়ের জন্য একটি মানসিক ব্যাধির হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলকাতার তিলজলা এলাকায় বিশ হাজার টাকা মূল্যের বাড়ি শুদ্ধ একখন্ড জমি উক্ত সোসাইটিকে দান করেছিলেন।

এই বছরের ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনজলা এলাকায় মানসিক চিকিৎসার জন্য তাঁর প্রদত্ত আর্থিক দানে প্রতিষ্ঠিত 'লুম্বিনী পার্ক' হাসপাতালের উদ্বোধন হয়। বর্তমান বছরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম রূপে প্রবর্তন করা স্থির হয়। তখনও বিজ্ঞান বিষয়ের পরিভাষা বাংলায় ছিল না— তদানীন্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় এই দুরূহ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজশেখর বসুকে।

১৯৪৩- এ রাজশেখরের দ্বিতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ 'কুটির শিল্প' প্রকাশিত হয়। এইবছরেই আরও দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়— কালিদাসের 'মেঘদূত' — মূল,অনুবাদ ও অণ্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টীকা এবং 'ভারতের খনিজ'।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে রাজশেখর (১৩৫২-৫৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি পদ গ্রহণ করেন। এইবছরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী পদক প্রাপ্ত হন। ১৯৪৫-এ তাঁর মাত্র একটি গল্প নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত হয় 'গামানুষ জাতির কথা।' বিস্তারিত বিবরণ— 'গা-মানুষ জাতির কথা' রাজশেখর বসু। ছোটগল্প গ্রন্থমালা-২৫। কবিতাভবন, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। পৌষ ১৩৫২, ডিসেম্বর ১৯৪৫। পৃঃ ২,২,১৬। রচনাকাল; ৩০.১১.১৯৪৫।

১৯৪৬ -এ রাজশেখর বসু-র বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাল্মীকি রামায়ণ'— এর সারানুবাদ প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭- এর ২রা নভেম্বর রাজশেখরের সভাপতিত্বে তাঁরই বাড়িতে সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য গঠিত পরিভাষা সংসদের অধিবেশন বসে। এর অন্যান্য সদস্যরা হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়,পতঞ্জলী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এই বছরেই শান্তিনিকেতনে রাজশেখরের উপস্থিতিতে অমিতাভ চৌধুরীর পরিচালনায় 'ভুশণ্ডীর মাঠে'-র নাট্যরূপের অভিনয় মঞ্চস্থ হয়।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত হয় 'সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা'— প্রথম মুদ্রণের ভূমিকায় তাঁর নাম উল্লিখিত হয় প্রথমে।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে রাজশেখরের আর একখানি বিখ্যাত জনপ্রিয় গ্রন্থ মহাভারতের সারানুবাদ প্রকাশিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ— কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদও রাজশেখর বসু। (ভূমিকা, বিষয়সূচি, অষ্টাদশ পর্ব; এবং গ্রন্থে বহু ব্যক্তি স্থান অস্ত্রাদির বিবরণ সংবলিত পরিশিষ্ট)। এম.সি.সরকার এন্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। ১৩৫৬। পৃঃ ২৬ +৬৯৩, দামঃ কাপড়ে বাঁধাই-দশ টাকা, কাগজের মলাট -নয় টাকা। ভূমিকার তারিখঃ ১ আষাঢ়-১৩৫৬।

১৯৫০- এ পরশুরামের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'গল্পকল্প' প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৫৭। পৃঃ— ১৪৫। দাম—আড়াই টাকা।

সূচিঃ 'গা-মানুষ জাতির কথা' (১৩৫২), 'অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা' (১৩৫৫) 'রাজভোগ' (১৩৫৫), 'পরশপাথর' (১৩৫৫), 'রামরাজ্য' (১৩৫৬), 'শোনাকথা' (১৩৫৬), 'তিন বিধাতা' (১৩৫৭), 'চিরঞ্জীব' (১৩৫৭)।

এইবছরেই আরও প্রকাশিত হয় রাজশেখর বসু'র 'হিতোপদেশের গল্প'। গল্পসল্প গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা। মাঘ ১৩৫৭। পৃঃ ২+৩২ । দামঃ এক টাকা বারো আনা।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে 'চলন্তিকা'র অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় পরশুরামের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'ধুস্তুরীমায়া' ইত্যাদি গল্প। এরও প্রকাশক ছিলেন এম.সি.সরকার এন্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। ১৩৫৯। পৃঃ ১৮২। দামঃ তিন টাকা।

সূচিঃ 'ধুস্তুরী মায়া' (দুই বুড়োর রূপকথা— ১৩৫৭), 'রামধনের বৈরাগ্য' (১৩৫৮), 'ভরতের ঝুমঝুমি' (১৩৫৮) ' 'রেবতীর পতিলাভ' (১৩৫৮), 'লক্ষ্মীর বাহন' (১৩৫৮), 'অক্রূর সংবাদ' (১৩৫৯), 'বদন চৌধুরীর শোকসভা (১৩৫৯) , 'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট (১৩৫৯),রটন্তীকুমার(১৩৫৯),অগস্ত্যদ্বার(১৩৫৯),ষষ্টীর কৃপা(১৩৫৯),'গন্ধমাদন বৈঠক' (১৩৫৯) ।

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন অনুজ গিরীন্দ্রশেখরের প্রয়াণ ঘটে। এই বছরেই 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার (১৩৬০, শ্রাবণ) , রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা, প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ তে প্রকাশিত হয় পরশুরামের ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ- 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প'। এই গ্রন্থেরও প্রকাশক এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। চৈত্র,১৩৬০। পৃঃ-১৫২। দামঃ দুই টাকা আট আনা।

সূচিঃ 'কৃষ্ণকলি' (১৩৫৯), 'জটাধর বকশী' (১৩৫৯), 'নিরামিষাশী বাঘ' (১৩৫৯), 'বরনারীবরণ' (১৩৬০), 'একগুঁয়ে বার্থা'(১৩৬০),'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী'(১৩৬০), 'নিকষিত হেম' (১৩৬০), 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি' (১৩৬০), 'আতার পায়েস' (১৩৬০), 'ভবতোষ ঠাকুর' (১৩৬০)।

১৯৫৫ সালে রাজশেখর বসু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন। এই প্রথম তাঁর সাহিত্যের প্রতিভা ও অবদানের যোগ্য সরকারি স্বীকৃতি অর্জিত হলো। এই বছরেই ২৬ শে ফ্রেব্রুয়ারি অগ্রজ শশিশেখরের প্রয়াণ।

১৯৫৫-তেই রাজশেখরের অন্যতম প্রবন্ধগ্রন্থ 'বিচিন্তা' প্রকাশিত হয়।

১৯৫৬ সালটি রাজশেখরের সাহিত্যিক জীবনে গৌরবোজ্জ্বল বৎসর। এই বছরেই তিনি ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৫৬ তেই প্রকাশিত হয় পরশুরামের সপ্তম গল্পগ্রন্থ 'নীলতারা ইত্যাদি গল্প'। এরও প্রকাশক এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাঃ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩। পৃঃ-১৭৫। দামঃ তিনটাকা।

সূচিঃ 'নীলতারা' (১৩৬১), 'তিলোত্তমা' (১৩৬১), 'জটাধরের বিপদ' (১৩৬১), 'তিরি চৌধুরী' (১৩৬১); 'শিবলাল'(১৩৬১, 'নীলকণ্ঠ'(১৩৬১), 'জয়হরির জেব্রা (১৩৬২), শিবামুখী চিমটে' (১৩৬২),'দ্বান্দ্বিক কবিতা'(১৩৬২),'ধনুমামার হাসি'(১৩৬২) , 'মাঙ্গলিক'(১৩৬২), 'নিধিরামের নির্বন্ধ' (১৩৬২), 'স্মৃতিকথা' (১৩৬২)।

১৯৫৭সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশেখর বসুকে সাম্মানিক ডি.লিট প্রদান করে। এই উপাধি বিষয়ে রসসাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেনঃ'৭৭ বৎসর পেরিয়ে উপাধিলাভে কিছুমাত্র আনন্দের কারণ নেই, আর ডাক্তার উপাধি তো গড়াগড়ি যাচ্ছে।'

এই বছরে প্রকাশিত হয় পরশুরামের অষ্টম গল্পগ্রন্থ 'আনন্দী বাঈ ইত্যাদি গল্প'। প্রকাশক— এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। ১৩৬৪, পৌষ, ১৮৭৯ শকাব্দ। পৃঃ-১৬৪। দামঃ তিনটাকা।

সূচিঃ 'আনন্দী বাঈ' (শকাব্দ ১৮৭৮), 'চাঙ্গায়িনী সুধা' (১৮৭৮), 'বটেশ্বরের অবদান' (১৮৭৮), 'নির্মোকনৃত্য' (১৮৭৮) , 'ডম্বরু পন্ডিত' (১৮৭৮), 'দুই সিংহ' (১৮৭৮), 'কামরূপিণী' (১৮৭৮), 'কাশীনাথের জন্মান্তর' (১৮৭৮),গগন চটি(১৮৭৮), 'অদল বদল'(১৮৭৯),'রাজমহিষী'(১৮৭৯), 'চিঠিবাজি' (১৮৭৯), 'সত্যসন্ধ বিনায়ক' (১৮৭৯),'যযাতির জরা'(১৮৭৯)।

১৯৫৮ সালে 'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তি।

এই বছরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজশেখর বসুকে সান্মানিক ডি.লিট প্রদান করেন। ১৯৫৮-র অক্টোবর মাসে 'সাহিত্যতীর্থে' সংস্থা তাঁর বাসভবনে রাজশেখরকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই বছরেই রাজশেখর বসু-র পরবর্তী প্রবন্ধ গ্রন্থ 'চলচ্চিন্তা' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। প্রথম প্রকাশ— ১৮৮০ শক (১৩৬৫)। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৮৮২, পৃঃ-১৬০, দাম—তিন টাকা।

সূচিঃ 'আমাদের পরিচ্ছদ' (১৮৭৮), 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৮৭৮)'গল্পের বাজার' (১৮৭৯), 'সাহিত্যের পরিধি' (১৮৭৯), 'বানানের সমতা ও সরলতা' (১৮৭৯), 'আচার্য উপাচার্য' (১৮৭৯), 'আমিষ নিরামিষ' (১৮৭৯), 'গ্রহণীয় শব্দ' (১৮৮০), 'শিক্ষার আদর্শ' (১৮৮০), 'বাংলা সাইক্লোপিডিয়া' (১৮৭৭), 'অশ্লীল ও অনিষ্টকর' (১৮৮০), 'পরিপূর্ণ সাহিত্য'(১৮৮১), 'রচনা ও রচয়িতা' (১৮৮১), 'স্নেহদ্রব্য' (১৮৮১), 'রাশিরাশি' (১৮৮১), 'ধর্মশিক্ষা' (১৮৮২), রবীন্দ্র জন্মদিন (১৮৮১), 'পরিশিষ্টঃ সাহিত্য সংস্কার' (১৮৪৯), 'তামাক ও বড় তামাক' (১৮৪৯)।

১৯৫৯ সালে রাজশেখরের শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। এইসময়েই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এ'বছরেই প্রকাশিত হয় পরশুরামের নবম 'গল্পগ্রন্থ 'চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প'। এরও প্রকাশক এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। ১৩৬৬ কার্তিক, ১৮৮১ শকাব্দ। পৃঃ-১৪৯ মূল্যঃ তিন টাকা।

সূচিঃ 'চমৎকুমারী' (১৮৮০), 'কর্দম মেখলা' (১৮৮০), 'মাৎস্যন্যায়' (১৮৮০), 'উৎকোচ তত্ত্ব' (১৮৮০), 'প্রাচীন কথা' (১৮৮০, 'উৎকণ্ঠা স্তম্ভ'(১৮৮০),'দীনেশের ভাগ্য'(১৮৮০),'ভূষণ পাল'(১৮৮০),'দাঁড় কাগ'(১৮৮১),'গণৎকার'(১৮৮১) , 'সাড়ে সাত লাখ' (১৮৮১), 'যশোমতী' (১৮৮১); 'জয়রাম জয়ন্তী' (১৮৮১), 'গুপী সাহেব' (১৮৮১), 'গুলবুলিস্তান' (১৮৮১)।

১৯৬০-এর ১০ই জানুয়ারি লেখকও সাহিত্যিক গণ কর্তৃক তাঁর বকুলবাগানের বাড়িতে রাজশেখরকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সংবর্ধনার উত্তরে রাজশেখর বলেছিলেনঃ

"আপনারা এতজন মানী কৃতী গুণী এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন,আমাকে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার বিশেষ আনন্দের কারণ, যেসব বন্ধুদের মাঝে মাঝে পৃথক পৃথক দেখেছি, আজ তাঁদের একত্র দেখছি। আমার একটা মজ্জাগত লজ্জা আছে, বয়স আশি হলেও তা যায় নি। একটু আধটু প্রশংসা যদি দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে তাহলে অবশ্য খুশীই হই। কিন্তু যদি শিলাবৃষ্টির মতন ঘনীভূত প্রশস্তি মাথার উপর পড়ে তবে আতঙ্কিত হই, মনে হয় ধরিত্রী ফেটে গিয়ে আমাকে একটু আশ্রয় দিন। ভাগ্যক্রমে আমি কালা, আপনাদের অনেক কথাই শুনতে পাইনি, কিন্তু যেটুকু শুনেছি তাতেই আমার জরাগ্রস্ত কান লাল হয়েছে।....

...বাঙলা আর বিদেশী সাহিত্যে আমার জ্ঞান অতি অল্প, যে কারণে আমি সাহিত্যিক নই। আসলে আমি আধা মিস্ত্রী, আধা কেরানী। অভিধান তৈরি আর পরিভাষা বানান ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রীর কাজ, রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদ কেরানীর কাজ। হালকা বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি বটে, কেউ কেউ তা মন্দ বললেও অনেকের তা পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বাঙলা ভাষায় যাকে 'সৃজনধর্মী সাহিত্য' বলা হয় তার মধ্যে আমার লঘু রচনার স্থান নেই। শিশুসাহিত্যের মতন পরশুরামের লেখাও একটু খাপছাড়া আর বিপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে আছে।"

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল (বঙ্গাব্দ ১৩৬৭-র ১৩ বৈশাখ) দুপুরে বেঙ্গল কেমিকালের সভায় যোগদানের পূর্বে বিশ্রামরত অবস্থায় বেলা একটা নাগাদ এই কৃতী লেখকের জীবনাবসান ঘটে।

মৃত্যুর পরে রাজশেখরের প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা—

১) 'পরশুরামের কবিতা' প্রকাশকঃ এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাঃ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২, ১৩৬৭ কার্তিক ১৮৮২। পৃঃ-৭২। দামঃ দুই টাকা।

২) 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'-র ভূমিকা, মূলশ্লোক, অন্বয় ও অন্বয়ানুগামী অনুবাদ। প্রকাশক এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সনস্ প্রা.লি; ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। শ্রাবণ ১৩৬৮। পৃঃ ১৪+১৯১। দামঃ সাড়ে তিন টাকা।

৩) 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী', প্রথম খন্ড। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রচিত 'ভূমিকা' সংবলিত। প্রকাশক—এম.সি.সরকার অ্যান্ড

সনস্ প্রাঃ লিমিটেড; ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। আশ্বিন ১৩৭৬। পৃঃ ৪০+ ৩+৫১৯। দামঃ ১৫ টাকা।

সূচিঃ 'গড্ডলিকা' ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প। 'গল্পকল্প', 'জামাইষষ্ঠী', 'লঘুগুরু।'দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৮০।

৪) 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খন্ড। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বিরচিত ভূমিকা সংবলিত। প্রকাশক— এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাঃ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। আশ্বিন ১৩৭৬। পৃঃ ৪০+৪+৫৬৭। দামঃ ১৫ টাকা।

সূচিঃ 'কজ্জলী', 'আনন্দী বাঈ ইত্যাদি গল্প'; 'চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প'; 'চলচ্চিন্তা'; 'রবীন্দ্রকাব্য বিচার'। দ্বিতীয় সংস্করণঃ বৈশাখ ১৩৮১।

৫) 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী'; তৃতীয় খন্ড। শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী রচিত 'ভূমিকা' সংবলিত। প্রকাশক— এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাঃ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। আশ্বিন ১৩৭৬। পৃঃ ৪০+৩+৫৪৭। দামঃ ১৫ টাকা।

সূচিঃ 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' 'নীলতারা ইত্যাদি গল্প'; 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প 'বিচিন্তা'।

৬) 'রাজশেখর রচনাবলী' (১-৩খন্ড) ভূমিকা— হরপ্রসাদ মিত্র, ১৩৮৫, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড।

৭) 'অপ্রকাশিত রাজশেখর' দীপংকর বসু সম্পাদিত। এম.সি. সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাঃ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, মাঘ ১৩৮৭/ জানুয়ারি ১৯৮১, পৃঃ ৬৩। দামঃ পাঁচ টাকা।

সূচিঃ 'সন্ধান আলোকে'/ দীপংকর বসু; রাজশেখর বসু; সংক্ষিপ্ত জীবনী; 'আমের পরিণাম'; 'আনন্দ মিস্ত্রী'; 'প্রথম পরিচয়'; 'মাদ্রাজ যাত্রার ডায়েরী'; 'জীবনস্মৃতি (সমালোচনা)','পত্র হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা; দূর্গামোহন ভট্টাচার্যকে; জনৈক পত্র লেখককে; বুদ্ধদেব বসুকে লেখা; সৈয়দ মুজতবা আলীকে); রাজশেখর বসু গ্রন্থপঞ্জী। পরশুরাম (রাজশেখর বসু) রচিত গল্পের সম্পূর্ণ বর্ণানুক্রমিক তালিকা।

৮) 'পরশুরাম গল্পসমগ্র' / সম্পাদনা— দীপংকর বসু, কার্তিক ১৩৯৯, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাঃ লিমিটেড।

তথ্যসূত্র ঃ

১.প্রভাতকুমার দাসের 'রাজশেখর বসু (পরশুরাম)ঃ জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি' প্রবন্ধে উদ্ধৃত। দ্র. 'জলার্ক'পত্রিকার রাজশেখর বসুঃ পরশুরাম বিশেষ সংখ্যা/মানব চক্রবর্তী সম্পাদিত/কলকাতা,২০০৬

ঋণস্বীকার ও কৃতজ্ঞতা ঃ

১.'রাজশেখর বসু' (পরশুরাম) ঃ জীবনও গ্রন্থপঞ্জি/ প্রভাতকুমার দাস/ 'জলার্ক' পত্রিকার রাজশেখর বসুঃ পরশুরাম সংখ্যা/ কলকাতা বইমেলা, ২০০৭/ মানব চক্রবর্তী সম্পাদিত।

২.'কোরক' রাজশেখর বসু সংখ্যা, সম্পাদিত, তাপস ভৌমিক, বইমেলা ১৯৯৫।

## ২.২ (খ) বাংলা হাসির গল্পে পরশুরামের অবদান ও অবস্থান

ত্রৈলোক্যনাথের সার্থক উত্তরসূরি হলেন পরশুরাম। বাংলা হাসির গল্পের ধারায় তাঁর স্থানটি সুনির্দিষ্ট ও উচ্চমহিমায় আসীন।ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ইতিমধ্যেই মজলিশী আমেজ বা আবহ আমরা লক্ষ্য করেছি, পরশুরামে তার সার্থক উত্তরাধিকার। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, মুজতবা আলী ও প্রমথ চৌধুরীর পর থেকে এই মজলিশী আমেজ বাংলা সাহিত্য থেকে প্রায় হারিয়ে গেল। সে যাই হোক, পরশুরামের গল্পের আড্ডাস্থল কলকাতার ১৪ নং হাবশী বাগান লেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বাস্তবে ১৪নং পার্শীবাগানে ছিল পরশুরামের পৈতৃক বাড়ি। সেখানে 'উৎকেন্দ্র সমিতি' নামে একটি নিয়মিত আড্ডার আসর বসত। রায় বাহাদুর বংশলোচন ব্যানার্জীর বৈঠকখানায় কেদার চাটুজ্যের 'গল্পের আসর' (পরশুরামের অনেক বিখ্যাত গল্প এই পটভূমি থেকে উঠে এসেছে) পাঠককে মাঝে মাঝেই ত্রৈলোক্যনাথের গল্প স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে, পরশুরামের মজলিশী গল্প একান্তভাবেই কলকাতা-কেন্দ্রিক, নাগরিকতাই এইসব গল্পের মজলিশী মেজাজের মূল সুর। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গল্পেরই পটভূমিকা পল্লীবাংলা। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' যেমন নিবিড়ভাবে গ্রামীণ পটভূমিকে জড়িয়ে রয়েছে, তেমনি বিপরীত প্রান্তে রয়েছে পরশুরামের গল্পমালা- তাঁর 'গড্ডলিকা' বা 'কজ্জলী'-র প্রায় সব গল্পেরই উদ্ভব ও পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে কলকাতা-কেন্দ্রিক। কলকাতার নাগরিক জীবন-নগরজীবনের সংবাদপত্র, রাজনীতি, যুদ্ধের আলোচনা, ব্যবসা বাণিজ্য-এসবই পরশুরামের গল্পের উপাদান ও পটভূমি নির্মাণ করেছে। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম উভয়েরই গল্পের মূল আলম্বন বিভাব রঙ্গ-ব্যঙ্গ। তবে, ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে পাই প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আর পরশুরামের গল্পে বুদ্ধির কারুকাজ।

পৌরাণিক পরশুরাম তাঁর প্রধান অস্ত্র কুঠারের দ্বারা একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল দুষ্টের বিনাশ এবং সৎ-ন্যায় ও যুক্তিবাদী সমাজ তৈরি করা। কিন্তু আধুনিক পরশুরাম বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর লেখনী-কুঠারের দ্বারা ন্যায়নীতিভ্রষ্ট সমাজকে রক্ষা করতে চেয়েছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কৌতুক-নির্ভর হাস্যরসের সাহায্যে। বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর উচ্চপদাধিকারী রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' ছদ্মনামেই তাঁর হাসির গল্পগুলি লিখেছেন এবং এই নামেই তিনি বাঙালি পাঠকদের কাছে সমধিক পরিচিত। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে, তারপর একে একে তাঁর অনেক গল্পই প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি, তাঁর মৃত্যুর পরেও অনেক গল্প বেরিয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর গল্পগুলি যেমন বহুমুখী, তেমনি হাস্যরসের বৈচিত্র্যে ও পরম উপভোগ্য। হাস্যরসের বিভিন্ন শ্রেণীভেদ যেমন তাঁর গল্পে অনুভব করা যায়, তেমনি কোনো একটি নির্দিষ্ট গল্পের মধ্যে একাধিক গোত্রের হাস্যরসের মিশ্রণও দেখা যায়। সমালোচকের বিচারে তাঁর গল্পের হাস্যরস প্রধানত 'তিরস্কার'-ঘেঁষা', যার মূল লক্ষ্য সমাজ-সংস্কার। প্রমথনাথ বিশী এ'প্রসঙ্গে বলেছেন—

"ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন অশ্রুঘেষা, পরশুরামের প্রচ্ছন্ন তিরস্কার-ঘেঁষা, ব্যতিক্রম দুই ক্ষেত্রেই আছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির উদ্ভব ও পরিবেশ গ্রামাঞ্চল, পরশুরামের কলকাতা শহর। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে।.... তিনি (পরশুরাম) প্রতিভায়, পরিচয়ে ও স্বভাবে urban বা নাগরিক। সেইজন্য তাঁর রচনা ত্রৈলোক্যনাথের চেয়ে অনেক বেশি মার্জিত, অনুশীলিত ও ভব্যতাযুক্ত। ..... তবে দুজনকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করে পরিপূরক মনে করাই অধিকতর সংগত। তাঁদের রচনাকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও নগরপ্রধান কলকাতা শহরকে যেন একত্রে পাওয়া যায়। এ একটা মস্ত সৌভাগ্য। সুবল গড়গড়ি ও জাবালি যতই ভিন্নস্তরের ব্যক্তি হোক এক জায়গায় দুজনের মিল আছে। একজন হৃদয় দিয়ে অপরজন বুদ্ধি দিয়ে সংসারকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কেউই স্থিতাবস্থাকে স্বীকার করে নেননি।"[১]

পরশুরামের হাস্যরসের আবেদন মূলতঃ বুদ্ধির কাছে। তাঁর হাসি-র আড়ালে লুকিয়ে আছে সুগভীর মনীষা। জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর মননশীল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর হাসির গল্পগুলিকে বহুমাত্রিকতায় আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে।

পরশুরামের 'গড্ডলিকা' পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন —" দেখিলাম তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।"[২]

"গড্ডলিকা"-র অন্তর্গত 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে মহাযুদ্ধ-সমকালীন অসাধু ধর্মীয় ব্যবসার অন্তরঙ্গ ছবি প্রকটিত হয়েছে। আধুনিক বাণিজ্যবুদ্ধির সঙ্গে বাঙালির চিরকালীন ধর্মভীরুতা বা ধর্মীয় দুর্বলতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে ব্যঙ্গের উতরোল উল্লাস থেকে কৌতুকের স্নিগ্ধ ফল্গুস্রোতে প্রবাহিত ক'রে দিয়েছেন। ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এ'প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

".... পরশুরামের রসিকতার ভিত্তি সামাজিক লোকব্যবহার। তাঁর প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' বাঙালির লিমিটেড কোম্পানির মিথ্যাচার ও ভন্ডামির বস্তুতান্ত্রিক দ্বারোদ্‌ঘাটন। বাংলাদেশের যৌথ ব্যবসায়ের মধ্যে যে জালিয়াতির বাড়াবাড়ি আমাদের জাতীয় চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছে তার ব্যঙ্গাত্মক নিদর্শন হিসেবে গল্পটি তুলনাহীন। ব্যঙ্গ-চিত্রকরের

কৌশলে যে রমণীয় আতিশয্য থাকে সেই আতিশয্যেই গল্পটির শ্লেষের ঝাঁজ শেষ পর্যন্ত স্নিগ্ধ হয়েছে।"[৩]

শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর গেরুয়া কাপড় পরিধান, জুয়াচুরি, গন্ডেরিরামের দালালির কমিশনের হিসাবে পুণ্যের পরিমাণ-নির্দেশ, রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর জমাখরচের হিসাবমূলক ব্যবসায়ী বুদ্ধি— শেষপর্যন্ত ব্যবসায়ে ফেল-পড়া- এ সমস্ত বাস্তব ঘটনাকে কিছুটা হাস্যরসোচিত অতিরঞ্জন ও কল্পনার সাহায্যে উপভোগ্য হাস্যরসাত্মক অবয়ব দান করেছে। সর্বোপরি, ধর্মভীরু মানুষের পুণ্য লোভাতুবতার সুযোগ নিয়ে ধর্ম-ব্যবসায়ীদের জুয়াচুরি, কোম্পানী-আইনের ফাঁকফোকরের সুযোগ নিয়ে যৌথ কারবার ফেঁদে লোক ঠকানোর নিখুঁত পরিকল্পনা বিশ্বযুদ্ধসমকালীন অসাধু ব্যবসায়ীদের চরিত্র সম্যকরূপেই উদ্‌ঘাটন করেছে।

সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড-এর প্রসপেক্টাসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বলা হলোঃ সেবার ফুল থেকে সুগন্ধি তেল তৈরি হবে, প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলিতে ভ'রে বিক্রি হবে, এমনকি চরণামৃতও বোতলবন্দী করা হবে। ছাগবলিতে গন্ডেরিরামের আপত্তি থাকায় কুমড়ো বলি-র সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু বলিপ্রদত্ত ছাগের চামড়া যে রকম বাণিজ্যিক স্বার্থে কাজে লাগে, কুমড়োয় তা হবার নয়। সঙ্কটের সমাধানে এগিয়ে এসে বৈজ্ঞানিক বিপিন বলল—

> "কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে কিড-স্কিনের জুতো না হলেও বোধ হয় ভেজিটেবল শু' হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"[৪]

এই 'ভেজিটেবিল শু'-এর ভাবনা উদ্ভাবনীয়তার অভিনবত্বে এবং সুযোগমত কল্পবিজ্ঞানের চতুর ব্যবহারে এক উচ্চকিত হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। পরশুরাম দেখালেন, সুযোগসন্ধানীরা কীভাবে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানকে চতুরভাবে মিশিয়ে হীন বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করে। এই গল্পে পরশুরামের বিদ্রূপাত্মক লেখনীর অভিমুখকে ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার যথাযথ বিচারবোধে সঠিকভাবে নির্দেশ করেছেন— (১) ধর্মের বাণিজ্যিক ব্যবহারকে বিদ্রূপ (২) ঠকানোর জন্য বা ধোঁকা দেবার জন্য বৈজ্ঞানিকতার আরোপ, (৩) ব্যবসায়িক জালিয়াতির ক্ষেত্রে শ্রেণীবিশেষের প্রতি কটাক্ষ। অবশ্য। স্বার্থান্ধ ও পদলেহী বাঙালির প্রতিও কটাক্ষ আছে। এখানে পরশুরামের হাস্যরস স্পষ্টতঃই তিরস্কার - ঘেঁষা। এখানে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট— সামাজিক অসঙ্গতির সমালোচনা বা social criticism এখানে পরশুরামের হাস্যরসের সুর বেঁধে দিয়েছে।

সাধারণ, নিরীহ সংসারী মানুষের ধর্মভীরুতাকে পুঁজি ক'রে 'বাবা' বা গুরুঠাকুরদের লোক-ঠকানো ধর্মব্যবসার আর এক ছবি দেখতে পাই 'কজ্জলী'র 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে। এই গল্পেও পরশুরামের ব্যঙ্গ সেই একইরকম তিরস্কার-ঘেঁষা, তার সঙ্গে মিশেছে স্নিগ্ধ কৌতুকের ভিয়েন। এই গল্পের হাস্যরস একইসঙ্গে চরিত্র-কেন্দ্রিক ও পরিস্থিতি (সিচ্যুয়েশন)-নির্ভর। ভন্ড সাধু বিরিঞ্চিবাবা ও তার সাগরেদ কেবলানন্দের চরিত্র-স্বরূপ উদঘাটন করেছেন নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে। একইসঙ্গে , এইসব ভন্ড-প্রতারক 'বাবা'দের চারপাশে যেসব সংসারী মানুষজন মৌমাছির মতো ভিড় করে, তাদেরও চারিত্র বিশ্বাসযোগ্যরূপে উদঘাটিত হয়েছে। শুধু বিরিঞ্চিবাবাই নয়, জগন্নাথঘাটের মিরচাইবাবা, রাজশাহীর রেডিওবাবা প্রভৃতি বিচিত্র সব ভন্ড 'বাবা' বা গুরুঠাকুরের প্রসঙ্গ ও এখানে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এক অর্থে বলা যায়, 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ও 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্প দু'টি একে অপরের পরিপূরক। এই দু'টি গল্পেই মহাযুদ্ধ-সমকালীন আর্থিক সঙ্কটের সমাজে সংসারী মানুষের দ্রুত বক্রপথে ধনী হবার বাসনা এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে ভন্ড-প্রতারক ধর্মব্যবসায়ীদের কারবার ফেঁদে বসার বাস্তব চিত্র উদঘাটিত হয়েছে। এই দু'টি গল্পে পরশুরামের সমাজবীক্ষা সমগ্রতার কাঙ্খিত লক্ষ্য স্পর্শ করেছে।

আবার 'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পটিতে ব্যঙ্গ থাকলেও তার ঝাঁজ তেমন তীব্র নয়, বরং স্নিগ্ধ কৌতুকই যেন এই গল্পের আলম্বন- বিভাব। ট্রাম থেকে প'ড়ে গিয়ে নন্দবাবু তেমন আঘাত পাননি, অসুস্থও হননি। দুর্বলচিত্ত মানুষ ব'লে সে-কথা জোরের সঙ্গে কাউকে বলতেও পারেননি। তাঁর এই নিরীহ সরলতার সুযোগ নিয়ে সকলেই ইচ্ছামতো তাঁকে ব্যবহার করেছে। সান্ধ্য আড্ডার বন্ধুদের অযাচিত পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমে নন্দবাবু গেলেন একজন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে। অ্যালোপ্যাথির মতে রোগটা হলো —'Cerebral tumour with strangulated gangila'যা উৎকট রকম হাস্যোদ্দীপক। এর চিকিৎসা হলোঃ ট্রিফাইন ক'রে মাথার খুলি ফুটো ক'রে অস্ত্রোপচার করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। কারণ, অভ্যন্তরে 'শর্ট-সার্কিট হয়ে গেছে। বিভ্রান্ত চিত্তে আতঙ্কিত নন্দবাবু গেলেন জনৈক হোমিওপ্যাথের কাছে। হোমিওপ্যাথ-এর মতে, আগে অ্যালোপ্যাথির বিষ তাড়ানোর ওষুধ দেওয়া দরকার। তাঁর মতে, রোগটা হয়ত বা 'ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস'। এরপর নন্দবাবু গেলেন কবিরাজের কাছে। রোগের লক্ষণ মিলিয়ে কবিরাজ রায় দিলেনঃ রোগটির নাম 'উদুরি'। অতঃপর নন্দবাবু জনৈক হাকিমের শরণাপন্ন হলেন। এইভাবে পরস্পর বিরোধী নানাবিধ চিকিৎসাশাস্ত্রের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে প'ড়ে নন্দবাবুর জীবনে সত্যি এক অভিনব চিকিৎসা-সঙ্কট দেখা দিল। এই গল্পে নন্দবাবুর জীবনে যে অভিনব চিকিৎসা-সঙ্কট দেখা দিল, তার আয়নায়, উজ্জ্বলবাবুর ভাষায় বলা যায়— "অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ এবং কবিরাজ এই তিনটি শ্রেণির মানুষই নিজেদের শ্রেণিতে ছদ্মবেশী হাতুড়েকে খুঁজে পাবেন সন্দেহ নেই।"[৫]

'লম্বকর্ণ' পরশুরামের বহুপঠিত বহুখ্যাত গল্পগুলি অন্যতম। প্রৌঢ় দম্পতির দাম্পত্যকলহকে কেন্দ্রে রেখে এগল্পে যে অম্লমধুর হাস্যরসের কাহিনি বোনা হয়েছে,তা শেষ পর্যন্ত কৌতুকরসের স্নিগ্ধ ফল্গুস্রোতে বহমান। লম্বকর্ণ নামে একটি

মানুষ্যেতর প্রাণী এই দাম্পত্যকলহের মধুরেণ সমাপয়েৎ মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে। বংশলোচনবাবু আদর্শবান ও দয়ালু মানুষ। লম্বকর্ণ নামে হঠাৎ এসে- পড়া একটি ছাগলের নানাবিধ অত্যাচারে বিড়ম্বিত হয়েও তাকে বাড়ি থেকে চিরকালের মতো তাড়িয়ে দিতে মানসিকভাবে খুবই কষ্ট পেয়েছেন। দারোয়ান চুকন্দর শিং-এর তৎপরতায়, অনেক খোঁজাখুঁজির পরে, লম্বকর্ণের অভিভাবক কেরোসিন ব্যান্ড-এর কর্ণধার লাটুবাবু এসে লম্বকর্ণকে নিয়ে যান। কিন্তু লম্বকর্ণের কীর্তিকলাপে অতিষ্ঠ হ'য়ে লাটুবাবু পত্রপাঠ লম্বকর্ণকে বংশলোচনবাবুর কাছে ফরৎ দিয়ে যান। ক্ষতিপূরণ বাবাদ নগদ ১০০ টাকা আদায় করতে ভোলেন না। সুপ্ত ও অতৃপ্ত বাৎসল্যের প্রেরণীয় বংশলোচন বাবু একান্ত শিশুসুলভ একটি কাজ ক'রে ফেলেছিলেন। তা হলোঃ বিদায়বেলায় লম্বকর্ণের গলায় মাদুলির মতো একটি পরিচিতি- জ্ঞাপক চিত্রকূট ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। সাবালক সচেতন ব্যক্তির এইরকম বালসুলভ কাজ যেমন তার চরিত্রের অসঙ্গতির দ্যোতক, তেমনি একইসঙ্গে তা রীতিমত কৌতুকোদ্দীপকও বটে! ইতিমধ্যে গল্পকথনের কৌশল হিসেবে আড্ডার সদস্য কেদার চাটুজ্জের মুখে লম্বকর্ণের কাহিনি অনুসরণে এক ভুটে ছাগলের শেষপর্যন্ত সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর বাঘে রূপান্তরিত হবার গল্প পরিবেশিত হলো। সবশেষে, লম্বকর্ণকে বিদায় দিয়ে ফেরার সময় কালবৈশাখীর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে বংশলোচনবাবুর প্রাণসংশয় হয় এবং পরম পরিত্রাতার মতো লম্বকর্ণ তাঁর প্রাণরক্ষা করে। ফলে, বিপদের দিনে পরীক্ষিত বন্ধু হিসেবে লম্বকর্ণ বংশলোচনবাবুর বাড়িতে স্থায়ী আশ্রয় পেয়ে গেল। এই সঙ্গেই স্ত্রীর সঙ্গে বংশলোচনবাবুর ঘনিয়ে-ওঠা দাম্পত্য কলহের মধুর পরিসমাপ্তি ঘটল। লক্ষ্য করবার মতো বিষয় হলো এই যে, এই মিলনান্তক কমেডির যাবতীয় ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে স্নিগ্ধ হাস্যরসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহের মাধ্যমে।

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পটিরও মুখ্য বিষয় দাম্পত্যকলহ, এই কলহ-কাহিনিও ভৌতিক কাহিনির ছায়ায় অম্লমধুর রসে স্নিগ্ধ হ'য়ে পরিবেশিত হয়েছে বৈঠকী মেজাজে। শিবু এবং তার স্ত্রী নৃত্যকালীর মধ্যে নিত্য ঝগড়া লেগেই থাকত। একদিন নৃত্যকালীর কানে এলো যে তার স্বামীর চরিত্র-দোষ ঘটেছে। সেদিন ঝগড়া চরমে উঠল এবং শিবু স্ত্রীর হাতে ঝাঁটার বাড়ি খেল। পরম অভিমানে ও অতীব দুঃখে শিবু কলকাতার কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করল স্ত্রীর মৃত্যু, এজন্য উপযুক্ত মানতও সে করল। কিন্তু দেবতা তার প্রার্থনার বিপরীত অর্থ করেছিলেন। তাই বাড়ি ফিরেই কলেরায় শিবুর মৃত্যু হয়। মরার পর ভূত হ'য়ে সে ভুশণ্ডীর মাঠে ত্রিভঙ্গ আকৃতির নেড়া বেলগাছে আশ্রয় নিল। ভুশণ্ডীর মাঠে শিবুর আগে থেকেই বসবাস করছিল প্রেত কারিয়া পিরেত এবং যক্ষ নাদু মল্লিক। জীবিত অবস্থায় এরাও দাম্পত্য-কলহে জর্জরিত হয়েছে। গল্পের ক্রমপরিণতিতে এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল শিবুর তিনজন্মের তিন স্ত্রী আর নৃত্যকালীর তিনজন্মের তিন স্বামী মিলে এক অভিনব ও বিপুল হাস্যোদ্দীপক ভৌতিক দাম্পত্য- সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। জন্মান্তরবাদ ও পাতিব্রতের সংস্কার — এই দু'য়ের পরস্পর জড়িত-মিশ্রিত অসঙ্গতি পাঠক হৃদয়ে উতরোল হাস্যরস সৃষ্টি করেছে।

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পটিতে ভূত-প্রেত জাতীয় চরিত্রের আমদানী ক'রে পরশুরাম কিছুটা যেন ত্রৈলোক্যনাথের ঘরানার কাছাকাছি চলে এসেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের মতোই এই গল্পেও আগাগোড়া রয়েছে লঘু বৈঠকী মেজাজ। তবে ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে প্রাচীন বৈঠকী গল্পের ভঙ্গিতে দীর্ঘ গল্পচক্রের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, সেখানে পরশুরাম আধুনিক ছোটগল্পের সংহত পরিসরের মধ্যে সেই বৈঠকী সুরকেই ধ'রে রাখার চেষ্টা করেছেন। বৈঠকী ভঙ্গির মধ্যেই তিনি ব্যঙ্গ রূপক ও কৌতুকের যথাযথ মিশ্রণ ঘটাতে পেরেছেন। গল্পটির মূল বক্তব্য পাই এর পরিণত উপসংহারে— একেবারে শেষ অধ্যায়ে।

এই গল্পের উপসংহার প্রসঙ্গে উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী হাজির হয়ে যে উৎকট ভৌতিক দাম্পত্য সমস্যা পাকিয়েছে তার সমাধানকে লেখক শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাড়ুজ্যে, নরেশ সেন ও যতীন সিংহ- এই চারজন তৎকালীন নীতি-শ্লীলতার কলহকারী সাহিত্যিকদের ওপর বরাত দিয়ে বেঁচে গেছেন।"[৬]

উজ্জ্বলবাবুর মতে, পরশুরামের এ-জাতীয় গল্পগুলি ('লম্বকর্ণ', 'স্বয়ম্বরা', 'দক্ষিণরায়', 'মহেশের যাত্রা' ইত্যাদি) মূলত - (১) বৈঠকী আমেজে লেখা, (২) কিছু মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে ব্যঙ্গ এসব গল্পে অবশ্যই আছে,তথাপি- (৩) বিশুদ্ধ আনন্দদানের জন্যই পরশুরাম এই গল্পগুলি লিখেছেন। এই গল্পে পরশুরামের সমাজবীক্ষার কেন্দ্রে রয়েছে দাম্পত্যের একনিষ্ঠতার নৈতিকতা- কেন্দ্রিক সমস্যা ও সঙ্কট।

পরশুরামের সমাজবীক্ষার অন্য'প্রান্তে' রয়েছে 'মহাবিদ্যা' গল্পটি। এই গল্পটিতে শেষপর্যন্ত চৌর্যকেই 'মহাবিদ্যা' বলে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে, একেবারে প্রচলিত বাংলা প্রবাদের সঙ্গে মিলিয়ে। নাট্যসংলাপের ঢঙে লেখা এই গল্পটিতে শেষ পর্যন্ত চৌর্যের যে স্তরটিকে পরম মোক্ষ বা মহাবিদ্যা ব'লে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে তা কার্যত রাষ্ট্রীয় চৌর্য বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত চৌর্যবিদ্যার মন্ত্রগুপ্তি- নানা উপায়ে গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের শ্রম শোষণ ক'রে তার ন্যায্য প্রাপ্যটুকু কেড়ে নেওয়া। আপাতগম্ভীর পরিবেশ বজায় রেখে অত্যন্ত কুশলী দক্ষতায় চুরিবিদ্যার মহিমাকীর্তন করা হয়েছে এই গল্পে। চুরি, জোচ্চুরি, ডাকাতি- প্রত্যেকটি বৃত্তির চমৎকার পারস্পরিক তুলনা ক'রে পরশুরাম শেষ পর্যন্ত চুরিবিদ্যাকেই বড়বিদ্যা রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন। শেষপর্যন্ত 'মহাবিদ্যা'র অর্থ দাঁড়িয়েছে-বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজের পথে এনে সংসারের মঙ্গলের জন্য কিছু 'আদায় করা'। 'কেড়ে নেওয়া'তে জগদগুরুর আপত্তি আছে, তাই 'আদায় করা'। অবশ্য ধনতান্ত্রিক শোষণমূলক

ব্যবস্থার সমালোচনার পাশাপাশি এ'গল্পে ভিন্নপথে অধিকার আদায়ের ইঙ্গিত (অথবা আশঙ্কা) রয়েছে। মজদুর পাঁচু মিঞা যখন জগদ্‌গুরুকে বলেছে তার জন্যে গুরুদেব কোন্ বিদ্যা রপ্ত করার পথনির্দেশ দিলেন ? তখন জগদ্‌গুরু তাকে বলেছেন— "তুমি এখানে এসে ভাল করনি বাপু। তোমার গুরু রুশিয়া থেকে আসবেন, এখন ধৈর্য ধরে থাকো।"

সাম্যবাদী আদর্শে উদ্দীপিত হ'য়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার নেতৃত্ব যে শতাব্দীশেষে কোন্ গড্ডলপ্রবাহে নিমজ্জিত হবে, তারও সুক্ষ্ম ইঙ্গিত এই গল্পের শেষে দিয়ে রেখেছেন পরশুরাম। তাঁর সমাজবীক্ষার গভীরতা ও দূরদর্শিতা ধরা পড়েছে ইউনিয়ন-নেতা মিস্টার গুহা এবং ব্যবসায়ী মিস্টার গ্র্যাব-এর কথোপকথনের মধ্যে। রাজনীতিক মিস্টার গুহা মজদুর পাঁচু মিঞাকে বলেছে— 'দশ হাজার টাকা চাঁদা তুলতে পারিস ? ইউনিয়ন খুলে এমন হুড়ো লাগাব যে এখনি তোদের মজুরি পাঁচগুণ হয়ে যাবে।' তখন ব্যবসায়ী মিস্টার গ্র্যাব তাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছেন- 'সাবধান, আমার চটকলের ত্রিসীমানার মধ্যে যেন এসো না।' তখন চতুর রাজনীতিক মিস্টার গুহা চুপি চুপি প্রস্তাব দিয়েছে— 'তবে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা করবো কি ?' এইরকম গোপন বোঝাপড়া এবং ভ্রষ্টাচারে তলিয়ে-যাওয়া নেতৃত্ব তো আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে অনেক দেখেছি। পরশুরামের দূরদর্শী সমাজবীক্ষা একারণেই শ্রদ্ধেয়।

প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশ, পৌরাণিক আবহ ও পৌরাণিক কিছু চরিত্রকে নিয়ে পরশুরাম ভিন্ন স্বাদের কিছু গল্প রচনা করেছিলেন, যা হাস্যরসের মধ্যে গাম্ভীর্যের মোড়ক এনে এক অভিনব রসাস্বাদনের পথ খুলে দিয়েছে। 'জাবালি', 'হনুমানের স্বপ্ন' 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'প্রেমচক্র', 'পুনর্মিলন' এই জাতীয় গল্প। এর মধ্যে 'জাবালি' পরশুরামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। জনৈক সমালোচক ঠিকই বলেছেন যে, জাবালি ধরনের চরিত্র নির্মাণের মধ্যেই পরশুরামের ব্যক্তিত্বের মৌল স্বর যথাযথভাবে ধরা পড়েছে, এই গল্পেই পরশুরামের আদর্শগত অবস্থানকে সঠিক তাৎপর্যে উপলব্ধি করা যায়। পরশুরামের লেখক-সত্তার ধ্রুপদী মানসিকতা ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানের নিষ্ঠা ধরা পড়ে এই গল্পে। প্রমথনাথ বিশী' যথার্থ তাৎপর্যেই জাবালিকে পরশুরামের 'symbolic Hero'বলেছেন। ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন "লোকায়ত দর্শনের নির্ভীক প্রতিনিধি শালপ্রাংশু জাবালি সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ বুদ্ধির অসামান্য দৃষ্টান্ত। .... যেন পরশুরাম তাঁরই বাস্তববাদী যুগের এক প্রতিনিধিকে এনে গল্পের মধ্যে হাজির করেছেন। জাবালি বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক চেতনার নির্মোহ, সত্যসন্ধ, নির্ভীক ইহকালনিষ্ঠার ভাবমূর্তি।"[৮]

জাবালি কঠোর রকমের বাস্তববাদী,ইহলোক ছাড়া পরলোক বা আধ্যাত্মিকতায় তাঁর কোনো মোহ নেই। শাস্ত্রীয় আচার তিনি প্রায় কিছুই মানতেন না, জপতপ ত্রিসন্ধ্যা কিছুই করতেন না। তাঁর স্ত্রী প্রৌঢ় বয়সেও নিঃসন্তানা, সেদিকেও জাবালির নজর নেই। কারণ তাঁর পুন্নাম নরকের ভয় নেই। এইজন্য অযোধ্যার বিপ্ররা তাঁকে শ্রদ্ধা করত না, বরং পাপাচারী বা শাস্ত্রবিরোধী ব'লে চিহ্নিত করেছিল। জাবালির অকপট স্বীকারোক্তি— 'আমি সময় বুঝিয়া নাস্তিক হই, আবার অবসরক্রমে আস্তিক হইয়া থাকি।' দেবরাজ ইন্দ্র যখন শুনলেন জাবালি এক কঠিন তপস্যায় নিমগ্ন তখন বয়স্কা অপ্সরা ঘৃতাচীকে পাঠানো হলো জাবালির ধ্যানভঙ্গ করার জন্য। ঘৃতাচী নানা বিভঙ্গে জাবালির কাছে আবেদন জানাবার চেষ্টা করলেন। জাবালিকে শারীরিকভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জাবালির চোখে ঘৃতাচীর বিগত যৌবনের ক্লান্তির ছাপ ধরা প'ড়ে গেল সহস্র সযত্ন প্রসাধন সত্ত্বেও। জাবালির তিরস্কার ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও যখন ঘৃতাচী সংযত হলেন না তখন জাবালি-পত্নী হিন্দ্রলিনী কর্তৃক ঘৃতাচীকে সম্মার্জনী-প্রহারের ঘটনা যেমন তুচ্ছ সংসারের নিত্য বাস্তব, তেমনি একইসঙ্গে চরম কৌতুকোদ্দীপক! যাইহোক, ঘৃতাচী বিদায়ের পর নারদের মন্ত্রণায় ত্রেতা যুগের একমাত্র পাপাত্মা জাবালি নিক্ষিপ্ত হলেন নৈমিশারণ্যে। দক্ষের প্রশ্নের উত্তরে নির্ভীক জাবালি বলেছেন—

"হে সুধীবৃন্দ,আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা নিজেই জানি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্রতত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, অপৌরুষেয়, পরিবর্তনসহ।"[৯]

দৈব-চক্রান্তে জাবালিকে হত্যা ক'রে নরকদর্শনের ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু সামান্য নরকভোগের পরেই জাবালি প্রকৃত মহাত্মা বলে স্বীকৃতি অর্জন করলেন, বস্তুত এখানেই জাবালি তাঁর এতদিনকার কৃতকর্ম ও জীবনধারার যথাযথ ন্যায্য বিচার পেলেন। সে-সময়ে ব্রহ্মা তাঁকে বর দিতে চাইলেও জাবালি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁকে অনুরোধ জানালেন যে, জাবালি যেন এইভাবে যুগযুগ ধ'রে মানবমনকে সংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন।

এইভাবে এক নাস্তিক চার্বাককে, তার ইহলৌকিক নির্মোহ জীবনদর্শনকে কৌতুককর অসঙ্গতিপূর্ণ ঘটনার মধ্য থেকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা দিয়ে পরশুরাম এক ভিন্ন ধরনের জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পৌরাণিকী পর্যায়ে 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পটিও পরশুরামের কুশলী রচনা। রাবণবধের পর রামসীতার আশ্রয়ে হনুমান বেশ সুখেই ছিলেন, হঠাৎ গোল বাধালেন তাঁর পিন্ডলোভী পিতৃপুরুষেরা। যথাযথ পিন্ডদানের পরেও যখন স্বপ্নে অতৃপ্ত পিতৃপুরুষরা দেখা দিতে লাগলেন, তখন হনুমান বুঝলেন শুধু তাঁর পিন্ডদানেই এঁরা তৃপ্ত হবেন না, তাঁর পরে কে পিতৃপুরুষদের পিন্ড দেবে প্রশ্ন তা নিয়েই। তিনি সম্যকরূপেই বুঝতে পারলেন যে, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও এতদিন তিনি দার

পরিগ্রহ করেননি, তাই এত গোল! হনুমানের নবজাগ্রত বিবাহেচ্ছাকে সীতা অনুমোদন করলেন, তারপর হনুমান স্বজাতির মধ্যে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করতে চেয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করলেন। যাত্রাপথে দু' একটি ঘটনাসূত্রে বিবাহ এবং নরনারীর যৌনসম্বন্ধবিষয়ে কিছু শ্রুত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হলো।

এ'সম্পর্কে হনুমানের সবচেয়ে চমকপ্রদ অভিজ্ঞতাটি অর্জিত হলো কিচ্চট রাজকুমারী চিলিম্পার সন্নিধানে এসে। প্রথমে এই অসামান্যা রূপসী বানরীর প্রতি হনুমান কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বুঝলেন এই বানরী অতিশয় মুখরা এবং উদ্ধতও বটে। ব্যঙ্গ ক'রে চিলিম্পা হনুমানকে বলেছিলেন যে তিনি প্রেমের কিছুই বোঝেন না, অর্থাৎ হনুমানের মননে রোমান্স ও শৃঙ্গার কিছুই নেই। তখন ক্রুদ্ধ হ'য়ে, সহবত শেখাবার জন্য হনুমান চিলিম্পার কেশদাম মুঠিমধ্যে ধ'রে তাকে গগনপথে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করলেন কিষ্কিন্ধ্যায় জলকেলিরত সুগ্রীবের ক্রোড়ে। এ এক মধুর প্রতিশোধ কেননা একদা চিলিম্পা সুগ্রীবের প্রণয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং হনুমানকে খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন যে হনুমান যেন সুগ্রীবের কাছে প্রেমলীলা শিখে নেয়। যাই হোক, প্রৌঢ় বয়সে নবজাগ্রত বিবাহেচ্ছা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে হনুমান উপলব্ধি করলেনঃ তাঁর বক্ষাভ্যন্তরের দু'টি কক্ষে রাম-সীতার উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁদের জায়গায় আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তির স্থান হবে না। এই উপলব্ধির জন্য হনুমান যথেষ্ট গর্ব অনুভব করলেন। এই 'জিতেন্দ্রিয়, রামসীতায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ' বীরের চরিত্রটি পরশুরামের এই গল্পে নবমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পবননন্দনের পৌরাণিক মহিমা ও ভাবমূর্তি কিছুমাত্র কলুষিত বা স্খলিত না ক'রে কিছু কৌতুকহাস্যের আমদানী করেছেন। ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত এই গল্পটি প্রসঙ্গে বলেছেন—"'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পে পরশুরাম হনুমানের অলৌকিক শক্তি, রামসীতার প্রতি অনুরক্তি এবং চিরঞ্জীবত্বের ভিত্তির অভিনব বর্ণনা দিয়াছেন এবং ইহার সঙ্গে শৃঙ্গাররসের নানাপ্রকার সজীব দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া অপরূপ কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছেন; শৃঙ্গার গুণীভূত হইয়া হাস্যরসকে জটিলতা দান করিয়াছে।"[১০]

গল্পের অবয়বে পুরাণকল্প রূপকের আবরণে সমসাময়িক রাজনৈতিক বাস্তবকে ধরার বিশ্বস্ত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় 'তৃতীয় দ্যূতসভা' গল্পে। এই গল্পে ক্ষমতালাভের রাজনীতির যাবতীয় কপটতাকে কৌতুককর অসঙ্গতির মধ্যে ধরতে চেয়েছেন পরশুরাম। মূল মহাভারতে আছে দ্যূত্যক্রীড়া কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের মধ্যে ঘটেছিল দু'বার - দ্বিতীয়বার শকুনির পাশার চালে যুধিষ্ঠির পরাস্ত হন এবং সর্বস্বান্ত হন। পরশুরাম আরও একধাপ অগ্রসর হ'য়ে একটি তৃতীয় দ্যূতসভার কল্পনা করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন শঠতা বা কপটতা ক্ষমতালাভের রাজনীতির মূল ভিত্তি- তা সে শকুনি-দুর্যোধনের ক্ষেত্রেই হোক, পান্ডবদের ক্ষেত্রেই হোক অথবা প্রসারিত তাৎপর্যে সমকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রেই হোক! গল্পটি ঘটনা-প্রাধান্য ছেড়ে বক্তব্য-প্রাধান্য বা idea -নির্ভরতার দিকে ঝুঁকেছে, তাতে গল্পের হাস্যরস খুব জমাট না বাঁধলেও পরশুরামের সমাজবীক্ষার এক প্রসারিত দিক ধরা পড়েছে এই গল্পে। যে পাশার কূট চালে শকুনি যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করেছিলেন, জানা গেল যে সেই পাশা (বা অক্ষ) শকুনির বৈমাত্রেয় ভাই মৎকুনি উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু অক্ষক্রীড়ায় জয়লাভের পর শকুনি ও দুর্যোধন উভয়েই মৎকুনিকে 'গজভুক্তকপিত্থবৎ' বর্জন করেছেন। কুরুক্ষেত্রের মহারণের ঠিক পঁচিশ দিন আগে মৎকুনি যুধিষ্ঠিরকে আরও একটি শক্তিশালী ও কৌশলী পাশা উপহার দিলেন। শর্ত হলোঃ এই তৃতীয় দ্যূতসভায় যদি যুধিষ্ঠির জয়লাভ করেন তাহলে মৎকুনিকে গান্ধার রাজ্য উপহার দিতে হবে। বলরামের অধ্যক্ষতায় এই তৃতীয় দ্যূত্যসভায় যুধিষ্ঠির জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু অচিরেই মৎকুনির শঠতা তথা জারিজুরি ধরা প'ড়ে গেল। তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাক্রমে তের বৎসর পূর্বের দ্যূতক্রীড়ার কপটতার স্বরূপও প্রমাণিত হলো। পরশুরাম এই গল্পে দেখাতে চেয়েছেন অক্ষক্রীড়ায় (তথা রাজনীতিতে) কপটতা কোনো অপরাধ নয়, সুতরাং শকুনি কোনো অপরাধ না ক'রে থাকলে যুধিষ্ঠিরও কোনো অপরাধ করেননি। কৃষ্ণ -ভ্রাতা বলরামের বক্তৃতার মাধ্যমে পরশুরাম যুধিষ্ঠিরের অবাস্তব নৈতিকতার অসারতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু পৌরাণিক চরিত্রকে তার স্বমহিমায় যেহেতু প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে; মূলের প্রতি এই আনুগত্যের তাগিদ যেহেতু পরশুরামের পক্ষে এড়ানোর কোনো উপায় ছিল না, তাই গল্পের শেষে যুধিষ্ঠির তাঁর চরিত্রানুগ নৈতিকতায় ফিরে আসেন। বলরামের যুক্তিজাল ছিন্ন ক'রে, নিজের কপটতা- আশ্রিত জয়কে প্রত্যাখ্যান ক'রে কুরুক্ষেত্রের সম্মুখ সমরে পান্ডবদের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ফলে, তৃতীয় দ্যূতসভার পরিণতিতে গল্প আর কোথাও এগোয় না, মূল্যানুগত্যের জন্য হয়তো আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না; তবুও এই গল্পের মাধ্যমে সমকালীন ক্ষমতা অর্জনের রাজনীতির কপটচারিতার প্রতি পরশুরামের গুরুতর অশ্রদ্ধার মনোভাব গোপন থাকেনি। একে পরশুরামের সমাজবীক্ষার আর একটি ভিন্ন দিক হিসেবেই গ্রহণ করা যায়।

ক্ষমতার রাজনীতি সম্পর্কে পরশুরামের বীতস্পৃহ মনোভাব বা অশ্রদ্ধার আর এক প্রকাশ দেখি 'কজ্জলী'র দক্ষিণ রায়' গল্পে। 'তৃতীয় দ্যূতসভা'র তুলনায় 'দক্ষিণ রায়' উৎকৃষ্টতার গল্প,অত্যন্ত কুশলী পলিটিক্যাল স্যাটায়ার। রামজাদু অ্যাটর্নির সামান্য কেরানী বকুলাল দত্ত ঝোঁকের মাথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিপদে পড়লেন। পরে দৈবানুগ্রহে পিসীমার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'য়ে বকুলাল দত্ত কলকাতার নামজাদা ধনী হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু মানুষের প্রতিষ্ঠার লোভ কোনো সীমা মানে না, অসূয়া মনোবৃত্তিও চট ক'রে তৃপ্ত হয় না। পরধনে ধনী হয়েও বকুলাল রামজাদু অ্যাটর্নির সমকক্ষ হ'তে পারলেন

না, তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলেন না। কিন্তু অতীতমানের জ্বালা এখনও বকুলাল ভোলেননি। তাই ধনসম্পদ করায়ত্ত হবার পর বকুলালের ইচ্ছা হলো নির্বাচনে দাঁড়াবেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ নেবেন। বাইরে একটা ভান বজায় রাখলেন যে তিনি এই দুর্ভাগা দেশের জন্য কিছু করতে চান। সেজন্য খুব বেশি শারীরিক পরিশ্রম তিনি করতে পারবেন না। সহজতম উপায় হলো গভর্ণমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য হওয়া। কিন্তু সদস্য হওয়া সহজ কথা নয়। বৃটিশ সমাজ (অর্থাৎ শাসক পক্ষ) তাঁকে নমিনেশন দেবে না। ক্ষমতাশালী স্বদেশী রাকনৈতিক দল তাঁর কাছে সেই আমলের লাখ টাকা ঘুষ চাইল মনোনয়ন দেবার জন্য। ধুত্তোর বলে বকুবাবু ঠিক করলেন নিজে নিজেই ভোটে দাঁড়াবেন। সাউথ সুন্দরবন কেন্দ্র থেকে। ভোটের ২/৩ মাস আগে তাঁর কাছে খবর এলো তাঁর চিরশত্রু রামজাদুও 'খদ্দরের সুট বানিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন।' রামজাদুবাবুও ঐ একই কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন। বকুলালবাবুর দ্বিগুণ রোখ চেপে গেল, এ লড়াই তাঁকে জিততে হবেই। এইসময়, প্রায় অলৌকিক ঘটনার মতো একটি পোস্টকার্ড তাঁর হস্তগত হয়। জনৈক শ্রী রামগিধড় শর্মা তাঁকে দেখা করতে বলেছেন, তিনিই নির্বাচনে জয়লাভের উপায় বাতলে দেবেন। রামগিধড় একজন 'পলিটিক্যাল পরিব্রাজক', তাঁর পরামর্শে বকুলাল ব্যাঘ্রপার্টিতে জয়েন করলেন। ক্রীড সই করার সময় জানতে পারলেন যে, বাবা দক্ষিণ রায় এই দলের সহায়। তাঁর দয়ায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

রামগিধড় চলে যাবার পর আত্মবিশ্লেষণ ক'রে বকুলাল দেখলেন কাউন্সিলের সদস্যপদের চেয়েও চিরশত্রু রামজাদুকে জব্দ করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হ'য়ে গেল। এমন সময় সুন্দরবনে অমাবস্যার গভীর রাত্রে বাবা দক্ষিণ রায় বকুলালকে দর্শন দিলেন। বাবা দক্ষিণ রায় প্রথমে এক সৌম্য ব্রাহ্মণের মূর্তি ধ'রে দেখা দিয়েছিলেন। বাবার দেখা পেয়ে বকুলাল দেশের হিতব্রত, কাউন্সিলের নির্বাচন এসবই ভুলে গেলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে তিনি বাবার কাছে রামজাদু-নিধন কামনা করলেন। বকুলালের প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে বাবা এবার স্বমূর্তিতে দেখা দিলেন— বলা বাহুল্যতা কোনো মনোহর সুদর্শন মূর্তি নয়। খাঁটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। কিন্তু বকুলাল তো দক্ষিণ রায়ের শিকার নয়, তাঁর ব্যাঘ্রপার্টির সদস্য। বকুলাল যেহেতু ক্রীড সই করেছেন, তাই তাঁকে জাতে তুলেদেওয়া বা গোত্রান্তর ঘটানো দক্ষিণ রায়ের পবিত্র কর্তব্য। বাঘবাবাজী তাই তাঁর পবিত্র ল্যাজটি বকুলালের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন, বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন। তারপর—

"বকুলাল কেঁদেই আকুল। ও বাবা, একি করলে? আমি ভাত খাব কি করে? শোব কোথায়? সিল্কের চোগা-চাপকান পরব কি করে? গিন্নী যে আর চিনতে পারবে না গো।

বাবা অন্তর্ধান। রামগিধড় বললে — আবার ক্যা হুয়া? গোল মত কর। এখন ভাগো, শত্রু পকড়-পকড়কে খাওগে। বকুলাল নড়েন না,কেবল ভেউ ভেউ কান্না। রামগিধড় খ্যাঁক করে তাঁর পায়ে কামড়ে দিলে। বকুলাল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালালেন।"[১১]

বকুলাল বাঘ হলেন বটে, তবে নখদন্তহীন। অর্থাৎ নিরামিষ বাঘ! বাঘের কোনো স্বভাব-গুণই তিনি অর্জন করতে পারলেন না। না পারলেন কাঁচা মাংস খেতে, না পারলেন হিংস্র আক্রমণ করতে। ফলে, তাঁর নির্বাসন হলো আলিপুরের চিড়িয়াখানায়— এক আনা খরচ করলেই তাঁকে দেখে আসা যায়। অত্যন্ত ক্ষমতালিপ্সা এবং বিষাক্ত অসূয়া-র পরিণতি কী হ'তে পারে, তা কৌতুককর ফ্যান্টাসির মধ্য দিয়ে পরশুরাম দেখাতে চেয়েছেন। বঙ্গীয় উচ্চাভিলাষী রাজনীতিকদের এক ব্যঙ্গাত্মক ক্যারিকেচার তৈরি করেছেন 'দক্ষিণ রায়' গল্পে, দেখালেন ক্ষমতার রাজনীতিতে, গণভিত্তিহীন বাঙালি কখনোই প্রকৃত বাঘ হ'য়ে উঠতে পারে না। হ'তে পারে বকুলালের মতো নখদন্তহীন নির্বিষ বাঘ, তারা বৃটিশ বা অন্য শত্রুদের কোনোভাবেই আক্রমণ করতে পারে না, বরং সুযোগসন্ধানী চতুর শৃগাল-সদৃশ রাজনীতিকের সামান্য কামড়েই অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত মূর্তিমান ক্যারিকেচার রূপে চিড়িয়াখানার দ্রষ্টব্যরূপে তার স্থান হয়। এই গল্পের বকুলালের ব্যাঘ্রে রূপান্তরের অংশটির ব্যাঙ্গাত্মক ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারেননি ব'লে ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত গল্পের এই অংশের কঠোর সমালোচনা করেছেন—

"দক্ষিণ রায় সম্পর্কিত পাঁচালী অতিশয় মুখরোচক রচনা, বকুলাল দত্তের জীবনের প্রথমার্ধের নাটকীয় পটপরিবর্তন উচ্চাঙ্গের কমেডি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই আর বকুলালের ব্যাঘ্রত্বপ্রাপ্তির কাহিনী এত উদ্ভট ও আজগুবি যে ইহাকে কমেডির পর্যায়ে ফেলা যায় না। কমেডির প্রধান লক্ষণ সম্ভব ও অসম্ভবের লুকোচুরি। এখানে সম্ভাব্যতার বাষ্পও নাই, রূপকথার আভ্যন্তরীণ সংহতি বা মনস্তাত্ত্বিক সুসঙ্গতিও নাই।"[১২]

শ্রদ্ধেয় সমালোচক যাকে 'উদ্ভট' ও 'আজগুবি' বলেছেন, তাকেই আমরা ফ্যানটাসি বলতে চাই। গল্পের ব্যঙ্গাত্মক ফ্রেমের সঙ্গে এই ফ্যানটাসিকে চমৎকার কৌশলে মিশিয়ে দিয়ে লেখক তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যকে একটি সুপরিণত উপসংহারে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। এই ফ্যানটাসির সাহায্যেই পরশুরামের সমাজবীক্ষা এখানে শৈল্পিক উৎকর্ষ অর্জন করেছে।

সাধারণ বাঙালি (এমনকি অন্য ভাষার লেখকরাও) লেখকরা তরুণ বয়সে লেখালেখি শুরু করেন, প্রথমে তাঁদের লেখায় কিছুটা অপরিপক্কতার ছাপ থাকে, সাহিত্যচর্চার ধারাবাহিকতায় ক্রমশঃ তাঁরা পরিণত হ'য়ে ওঠেন, পরিণত অভিজ্ঞতার

স্পর্শে গল্পের ভাব ও লিখনশৈলী ক্রমশঃ উৎকর্ষের শিখরে উন্নীত হয়। পরশুরামের ক্ষেত্রে এর কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তিনি গল্পকার রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রায় মধ্যবয়সে। সৃজনশীলতার প্রথম পর্বেই উৎকৃষ্ট গল্পগুলি লিখে ফেলেছিলেন। প্রমথনাথ বিশী এ'প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে সাহিত্যিকরূপে রাজশেখর বসুর আত্মপ্রকাশ, যে বয়সে নাকি অধিকাংশ লেখকের আদিপর্ব শেষ হ'য়ে গিয়ে মধ্যপর্বে প্রবেশ ঘটে। বিয়াল্লিশের আগে পর্যন্ত তাঁর কোন সাহিত্যিক পরিচয় পাঠকের সম্মুখে ছিল না, হঠাৎ তিনি পাকা লেখা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। পাঠক একেবারে চমকে গেল, কিন্তু সে চমক পীড়াদায়ক নয়, সুখদায়ক। তিনি ধীরে সুস্থে পাঠককে তৈরী করে নিয়ে পরিণত রচনায় উপনীত হননি, পাঠককে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করিয়ে রাখেননি। পাঠকের সেই কৃতজ্ঞতা তাঁর জনপ্রিয়তাকে বর্ধিত করেছে।"[১৩]

কিন্তু জনপ্রিয়তা যেমন ধীরে ধীরে গা-সওয়া হ'য়ে আসে, বিস্ময়ের দ্যুতিও তেমনি ক্রমশ ম্লান হ'য়ে আসে। পরশুরামের সৃজনশীল তার ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠুর সত্য অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছিল। বিশেষতঃ 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী'র পরবর্তী গল্পগুলিতে। 'হনুমানের স্বপ্ন' 'গল্পকল্প' 'নীলতারা' 'ধুস্তুরীমায়া' 'চমৎকুমারী' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে ব্যঙ্গের ধার ও ভার ক্রমশঃ মন্দীভূত হ'য়ে এসেছে। 'গামানুষ জাতির কথা', 'পরশপাথর', 'তিন বিধাতা', 'ভীমগীতা' প্রভৃতি গল্পে দেখা যাচ্ছে বক্তব্য-প্রাধান্য হাস্যরসের মূল উদ্দেশ্যকে আবৃত ক'রে দিয়েছে। ঘটনা-সংস্থান বা সিচ্যুয়েশন- ভিত্তিক হাস্যরস এসব গল্পে বেশ কম, কথার মারপ্যাঁচে বা উৎকেন্দ্রিক কল্পনার অভিনবত্বে কিছু হাস্যরস সৃজনের চেষ্টা। তাছাড়া, 'ভীমগীতা' বা 'তিনবিধাতা' জাতীয় গল্পে গল্পরসও গৌণ, যেন গল্পের মোড়কে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। গল্পের মোড়কটি আবার নির্মিত হয়েছে প্রায়শঃই নাট্যসংলাপের বুনটে। পরশুরামের গল্পশৈলীর এই দুর্বলতা চোখে পড়ে প্রধানতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী গল্পগুলিতে। এ'প্রসঙ্গে সমালোচক পবিত্র সরকার যথাযথ মূল্যায়ন ক'রে লিখেছেন— "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকেই এই পর্ব শুরু হল, প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু স্বসম্প্রদায় ও মানবজাতির বৃহত্তর শুভাশুভ নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন এবং মাঝেমাঝেই পরশুরামের এলাকায় হানা দিতে লাগলেন। 'গামানুষজাতির কথা' দিয়ে এই প্রবণতার আরম্ভ, কিন্তু 'জাবালি'তে এর পূর্বসূত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।.....কৌতুকরঙ্গের গল্প লেখার পাশাপাশি প্রবন্ধও লিখে গেছেন তিনি, কিন্তু তাতে প্রত্যাশামতো কাজ হয়নি। এই হতাশা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এসে প্রচ্ছন্ন তিক্ততার চেহারা নিল পরশুরামের মধ্যে। 'গল্পকল্প'(১৩৫৭)-এর গল্পগুলিতেই মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায় তর্ক বাড়ছে, আখ্যান সংক্ষেপিত হচ্ছে। 'গামানুষ জাতির কথা' অধিকাংশত তর্ক, 'অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা'-ও 'তর্ক'— তবে এখানে তা নিজের সঙ্গেই, ..... তর্ক আছে 'রামরাজ্য'এ 'শোনাকথা'-য়, 'তিন বিধাতা'-য় 'ভীমগীতা'য়।"[১৪]

মহাযুদ্ধে মারণাস্ত্রের আস্ফালন, নির্বিচারে নরহত্যা ও আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বীভৎসতা পরশুরামকে ব্যথিত, ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করেছিল। বিচলিত পরশুরাম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ জাতিগুলির হীন স্বার্থকে কেন্দ্রে রেখে 'গামানুষজাতির কথা' গল্পটি লিখেছেন। এ'এক ভবিষ্যব্যাঞ্জক কল্পবিজ্ঞানের গল্প। এ গল্প সেই অনাগত ভবিষ্যতের গল্প বলে যখন গামারশ্মির প্রভাবে পৃথিবীর তাবৎ মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে আর ড্রেনের ইঁদুরেরা বিবর্তনের ক্রম অভিব্যক্তির ধারায় মানুষরূপে বিকশিত হয়েছে। ত্রিশ বৎসরেই তাদের ৭২০পুরুষ তবুও তারা কালে কালে প্রগতির শিখরে অধিষ্ঠিত হলো। তবে তাদের মধ্যেও এখনকার মানবজাতির মতো জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য, জাতিদাঙ্গা, বড় রাষ্ট্রগুলির ছোটো রাষ্ট্রগুলির প্রতি আগ্রাসী মনোভাব, পরাধীনতা ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা দেখা দিল। প্রচুর যুদ্ধবিগ্রহ ঘটল। সবশেষে বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতিগণ এক শান্তি-বৈঠকে মিলিত হলেন। সভায় আলোচনার মাধ্যমে কোনো শান্তির সুস্থিত লক্ষ্যে পৌছনো গেল না, তাই আচার্য ব্যোমবজ্র হাজির করলেন বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমা। এই বোমার শক্তি কসমিক বোমার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি। এই বোমার ওপর কার অধিকার বেশি তা নিয়ে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে বিস্তর বিতন্ডা দেখা দিল। সকলের টানাটানিতে বোমাটি মাটিতে প'ড়ে গিয়ে হঠাৎ ফেটে গেল— কোনো শব্দ বা আলো দেখা গেল না, কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র গামানুষজাতির ইন্দ্রয়ানুভূতি মুহূর্তের মধ্যে লুপ্ত হ'য়ে গেল । অর্থাৎ এই নতুন প্রজাতি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেল। এই গল্পে পরশুরাম বেশ কিছু বৎসরের জন্য মানুষের বিলুপ্তি কামনা করেছেন । এই গল্পে বক্তব্যের প্রাধান্য এবং হাস্যরসের স্বল্পতা সত্ত্বেও পরশুরামের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও যুদ্ধবিরোধী বলিষ্ঠ মানবতা সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য এই গল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন— " এই গল্পে পরশুরামের বিজ্ঞানমনস্কতা সবার উপরে টেক্কা দিয়েছে । ..... বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বচেতনায় গল্পের পটভূমি সারাপৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। পরশুরামের বলিষ্ঠ বিশ্বাস ও আশীর্বাদ এই গল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পলকে প্রলয় ঘটানো চরম দুর্যোগের দিনেও তিনি বিশ্ববিধানে অবিচলিত বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গল্পের ভরতবচনে বলছেন, " মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন, তারপর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি , পৃথিবী বিপুলা। তিনি অলসগমনা, দশ-বিশ লক্ষ বৎসরে তার ধৈর্য্যচুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বারবার গর্ভধারণ করবেন।"

এই আশ্বাসবাক্যে স্থিতধী পরশুরামের অস্তিবাদী জীবনদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে।" [১৫]

সমালোচক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার এই গল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন— "মানুষের প্রতি অসহ্য ঘৃণায় যেমন সুইফটের লিলিপুট, তেমনি পরশুরামের গামানুষ — মানুষ-ইঁদুর, লোভে-স্বার্থে সন্দেহে বিকৃত মানুষের রূপ। .....শেষ ঘোষণায় শোনা গেল দুরাত্মা অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে বসুন্ধরার দুঃখ নেই।" [১৬]

পরশুরামের হাসি যেমন "তিরস্কার-ঘেঁষা", তেমনি তাঁর হাস্যরসিক সত্তার আড়ালে যে মৌল প্রবণতাটি নিহিত তা হলো পরোপকারের সামাজিক আদর্শ । এই পরোপচিকীর্ষা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে তাঁর সমাজ-সংশোধনের মূল্যবোধ। জগদীশ ভট্টাচার্য সঠিকভাবেই মূল্যায়ন করেছেন পরশুরামের হাস্যরসিক সত্তার মৌল স্বরূপটিকে — "তাঁর স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা কোনোদিনই ব্যক্তিগত অসূয়ায় পরিণমিত হয়নি। তাঁর প্রেক্ষাপট বাংলার ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। হাস্যরসাত্মক রচনা যে মহত্তম সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে তা পরশুরামের রচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" [১৭]

আর একটি যথাযথ মূল্যায়ন পাওয়া যায় উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের বিস্ফোরণে। উজ্জ্বলবাবুর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করেই আমরা বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহার করতে পারি—

"আসলে হাস্যরসিক পরশুরাম মাঝে মধ্যে সমাজ-সংসারের বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা ও আদর্শহীনতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ভ্রুকুটি করলেও মূলত তিনি জীবনরসিক, সমাজ-সংসারের চাল চলনের সজাগ দ্রষ্টা।.....

.... মনে হয়, প্রজ্ঞাবান পরশুরামের কৌতুকের আড়ালে একইসঙ্গে লুকিয়ে ছিল সত্যসন্ধ জাবালি এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা— প্রলয়ের দুশ্চিন্তায় যিনি নির্ঘুম বিষণ্ন রাত কাটাতেন।" [১৮]

উল্লেখপঞ্জিঃ


১. দ্র. 'ভূমিকা' / পরশুরাম গল্প সমগ্র / কলকাতা ২০০৩/ দীপঙ্কর বসু সম্পাদিত / পৃঃ ৩২-৩৩
২. দ্র 'প্রবাসী' / অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ সন
৩. দ্র 'পরশুরামের গল্পে হাস্যরস'/ গল্প পাঠকের ডায়ারি/ কলকাতা, ২০০৫/ পৃঃ ৬৩
৪. দ্র. 'পরশুরামের গল্পসমগ্র'—/পৃঃ-৪৮
৫. দ্র. গল্পপাঠকের ডাযারি/ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার/পৃঃ-৬৪
৬. গল্পপাঠকের ডায়ারি/ পৃঃ ৬৫-৬৬
৭. দ্র. 'ভূমিকা'/ পরশুরাম গল্পসমগ্র/ দীপংকর বসু সম্পাদিত / পৃঃ২৭
৮. দ্র গল্পপাঠকের ডাযারি/ পৃঃ ৬৬
৯. দ্র. পরশুরামের গল্পসমগ্র / দীপংকর বসু সম্পাদিত/ পৃঃ ১৩২
১০. দ্র. হাস্যরসিক পরশুরাম 'কলকাতা' ১৩৮৬/ পৃঃ ১৩৪
১১. দ্র. পরশুরামের গল্পসমগ্র / দীপংকর বসু সম্পাদিত/ পৃঃ ১৪৫
১২. দ্র. পরশুরাম / কলকাতা, ১৩৮৬ পৃঃ ১৫২/দ্র.হাস্যরসিক পরশুরাম
১৩. দ্র. 'ভূমিকা' / শ্রী প্রমথনাথবিশী/ পরশুরাম গল্পসমগ্র/ দীপংকর বসু সম্পাদিত / পৃঃ ২০
১৪. দ্র. 'পরশুরামঃ ব্যক্তিগত বিবেচনা'/ 'পরিচয়' / শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৮ / পৃঃ ২০৯-২১০
১৫. দ্র. আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী / কলকাতা, ১৯৯৪ / পৃঃ ২৪৮
১৬. দ্র. গল্পপাঠকের ডায়ারি/ পৃঃ ৬৭
১৭. দ্র. আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী/ পৃঃ ২৫৭
১৮. দ্র. গল্পপাঠকের ডায়ারি/ পৃঃ ৬৯